ছেলেরও সন্দেশ না হ'লে চলে না। বুড়োবুড়ী বিশেষ ফাঁপরে পড়ল। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করল যে বুড়ো একদিন তাঁর আদুরে ছেলেটাকে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের নিকট নিয়ে যাবে। তিনি নাকি সকল লোকের প্রার্থনা পূরণ করেন—যে যা চায়, তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ তাই দেন। লোকের নানা রকম রোগ—তা যতই কঠিন হউক না কেন—তাঁর একবারমাত্র চোখের চাহনিতেই আরাম হয়ে যায়, সুতরাং ঐ ছেলেটার সন্দেশ খাওয়ার রোগও বোধ হয় তিনি সারিয়ে দিতে পারবেন।

"এই মনে করে, বুড়ো একদিন ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে হজরত মহম্মদের কাছে গিয়ে হাজির হল। পয়গম্বর তখন তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ দিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বুড়োর মুখ থেকে ছেলেটার সন্দেশ খাবার কাহিনী বেশ ভাল করে শুনে খানিকক্ষণ ছেলেটার পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর তাকে আর একমাস পরে তাঁর কাছে পুনরায় নিয়ে আসতে তার বাবাকে আদেশ করলেন। বুড়ো সেদিনকার মত ছেলেটাকে নিয়ে বাড়ী ফিরল। তার পর একমাস কেটে যাবার পর বুড়ো পুনরায় একদিন ছেলেটাকে নিয়ে পয়গম্বরের সভায় দেখা দিল। এবার তিনি ছেলেটাকে তার বাবার দুরবস্থার বিষয়—অত্যধিক সন্দেশ খাবার কুফল ইত্যাদি বেশ ভালকরে বুঝিয়ে ও নানা উপদেশ দিয়ে তাকে সন্দেশ খেতে বারণ করলেন ও শেষে উভয়কে বিদায় দিলেন। বাবা তার ছেলেটাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো এবং আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখতে পেলো যে, সেদিন থেকে তার ছেলের সন্দেশ খাওয়ার রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে। এখন পয়গম্বরের উপর বুড়োবুড়ী উভয়েরই কি অগাধ বিশ্বাসই না হলো। বুড়ো সেই থেকে পয়গম্বরের শিষ্যসভায় আসা-যাওয়া করতে লাগল। একদিন সে কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—'আপনি প্রথম দিন ছেলেটার সন্দেশ খাওয়ার রোগ সারিয়ে না দিয়ে একমাস পরে দিলেন কেন?' পয়গম্বর উত্তর করলেন, "আমিও তোমার ছেলের এখানে আসবার আগে তারই মত খুব সন্দেশ খেতে ভালবাসতুম,—সন্দেশ না হ'লে আমার চলত না; কিন্তু যখন শুনলুম যে তুমি তোমার ছেলেটার সন্দেশ খাওয়ার রোগ আমাকে দিয়ে সারিয়ে নিতে এসেছ তখন বুঝলুম যে, নিজে ও-বিষয়ে সংযমী না হ'লে তোমার ছেলেকে ও-বিষয়ে সংযমী হ'তে বললে কোন ফলই হবে না। তাই প্রথম দিন তোমার ছেলেটাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে আমি নিজে একটু একটু করে সন্দেশ খাওয়ার লোভ ত্যাগ করতে লাগলুম—শেষে এক মাসের মধ্যে ঐ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে সংযমী হ'তে শিখলুম। তারপর তোমার ছেলেকেও সন্দেশ খাওয়া সম্বন্ধে সংযমী করে তুললুম। সুতরাং এটা নিশ্চয়ই জেনো যে, কোন বিষয়ে নিজে সংযমী না হয়ে সেই বিষয়ে পরকে সংযমী হতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, আর তা' দিলেও সে শিক্ষা কোন কাজেরই হয় না।" পয়গম্বরের মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি শুনে বুড়োর চোখ খুলে গেল।"

ঐ সুন্দর গল্পটা মনে রেখে প্রত্যেক শিক্ষকেরই শিক্ষকতা করা উচিত। কেহ যদি তা না পারেন তাহলে তিনি যেন অপরের শিক্ষার ভার গ্রহণ না করেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই জানা উচিত যে, প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ভার সংযমের অবতার আর্য্য ঋষিদের হস্তে অর্পিত ছিল, আর সেই জন্যই তখনকার দিনে শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হত। এখন যে তা হওয়া সম্ভবপর নয়, সে কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। তবে আন্তরিক ইচ্ছা চাই—প্রকৃত সাধনা চাই। বর্ত্তমান যুগে মহামতি গোখলের দৃষ্টান্ত প্রত্যেক শিক্ষকেরই অনুকরণযোগ্য। তিনি মাসিক পঁচাত্তর টাকা মূল্যের শিক্ষকতাকেই হাস্য-মুখে আজীবন বরণ করে নিয়েছিলেন। আর তাও বলি, শিক্ষকদের দুরবস্থাসম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের ও ছেলের বাপ মাদের এরূপ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যাতে তাঁরা বেশ একটু সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করতে পারেন।

সঙ্গীত-রত্নাকর।

যদিও 'শীর্ষক' পাঠে বুঝা যায়—প্রবন্ধটী কোন সঙ্গীতগ্রন্থ বিষয়ক, তথাপি, নিঃসন্দেহ বোধের ও চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত 'সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়প্রদান আবশ্যক বোধ করিলাম।

বর্ত্তমান কালে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যতগুলি সঙ্গীত-গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে এই সঙ্গীত রত্নাকর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। পাঠ করিলেই বুঝা যায়, এই গ্রন্থ অন্যূন সপ্তশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মলাভ করিয়া সঙ্গীতকলাকে অত্যধিক উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছিল। এই গ্রন্থ এদেশের সর্ব্বাদিম নহে। ইহার পূর্ব্বেও এদেশে শত শত সঙ্গীতগ্রন্থের প্রচার ছিল। শার্ঙ্গদেব সেই সকল গ্রন্থের সার সংকলনপূর্ব্বক এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি প্রথমাধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছেন, আমি ভরত, * * * মতঙ্গ প্রভৃতির মত-পয়োনিধি নির্ম্মন্থন করিয়া এই সঙ্গীতরত্নাকর

প্রস্তুত করিলাম। (প্রথমাধ্যায়ের ১৪ হইতে ২০ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।)

সঙ্গীত মানবস্বভাবের অনুগামী, সুতরাং বলা যাইতে পারে—যে সময়ে মানবের সৃষ্টি, সেই সময়েই সঙ্গীতের অঙ্কুরোৎপত্তি; তবে তদ্বিষয়ক বিদ্যা, শিল্প বা কৌশল ক্রমে পর পর কালে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। যে সময়ে এদেশে বেদের আবির্ভাব হয়, সেই সময়েই এদেশে সঙ্গীতেরও অল্পাধিক পরিমাণে বিস্তৃতি ঘটে। সেইজন্য মূল সঙ্গীতশাস্ত্রের অপর নাম গান্ধর্ব্ববেদ এবং তাহা সামবেদের উপবেদ নামে খ্যাত। রত্নাকর-রচয়িতা শার্ঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

"সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ।"

পিতামহ ব্রহ্মা সামবেদ হইতে গীতবিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা গীতশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতা—এ কথার অর্থে অন্য কোন কিছু পাওয়া যাউক বা না যাউক, প্রাচীনতাপক্ষ পাওয়ার বাধা নাই। "সঙ্গীত-রত্নাকর" নামটী অন্বর্থ, অর্থাৎ সত্যসত্যই ইহা সঙ্গীতরত্নের সমুদ্র। কেন না, বিদ্যমান সময়ে যতগুলি সঙ্গীত গ্রন্থ পাওয়া যায়, এই রত্নাকর ব্যতীত আর সকলগুলিই প্রকরণ অর্থাৎ কোন এক অংশ লইয়া বিরচিত, কেবল একমাত্র এই রত্নাকরই সঙ্গীতের শাস্ত্র বা সম্পূর্ণ গ্রন্থ। গান, বাদ্য ও নৃত্য, এই তৌর্য্যত্রিক বিষয়ে যে কিছু জ্ঞাতব্য, যে কিছু শিক্ষিতব্য, সমস্তই ইহাতে অল্পাধিক পরিমাণে বিবৃত হইতে দেখা যায়। সুতরাং ইহা সঙ্গীতপ্রিয় লোকের অতীব প্রিয় ও আদরের বস্তু এবং সেই কারণে আমরাও ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত।

এই গ্রন্থে সঙ্গীতসংক্রান্ত কোন্ কোন্ বস্তু বর্ণিত আছে, তাহা জানাইবার নিমিত্ত একটী বিষয়-সূচী অর্থাৎ বর্ণিতব্য পদার্থের তালিকা প্রদান করিলাম; দেখিবেন, সঙ্গীত-রত্নাকর সঙ্গীতের সম্পূর্ণ শাস্ত্র কি না।

প্রথমাধ্যায়ের নাম স্বরাধ্যায়। স্বরাধ্যায়ে প্রথমে শরীরতত্ত্ব, পরে নাদোৎপত্তি, নাদের স্থান, শ্রুতিবিবরণ (শ্রুতি=শোরৎ)। শুদ্ধস্বর, বিকৃত স্বর, স্বরের কুল-জাত্যাদি বর্ণনা, সে সকলের ব্যবহার-প্রকার, শোরতের জাতি, গ্রামকল্পনা, মূর্চ্ছনা (মীড়), তান, শুদ্ধতান, কূটতান ও সে সকলের সংখ্যা, প্রস্তার (স্বর সাজাইবার নিয়ম), খণ্ডমেরু, নষ্টোদ্দিষ্ট (এ দুই বস্তুও স্বর সাজাইবার প্রণালীবিশেষ—যাহাকে স্বরলিপি বলে, তাহারই নিয়মাদি।) কাকলীপ্রয়োগের ও অন্তরাপ্রয়োগের নিয়মাদি, বর্ণলক্ষণ, ৬৩ প্রকার অলঙ্কার, ১৩প্রকার স্বরজাতির লক্ষণ, গ্রহস্বর ও অংশস্বর প্রভৃতি, কপাল ও কম্বল প্রভৃতি (ইহাও গানের জাতিবিশেষ) বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম রাগবিবেক। এই অধ্যায়ে গ্রামরাগ, রাগ, উপরাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা, রাগের অঙ্গ, ভাষাঙ্গ, উপাঙ্গ ও ক্রিয়াঙ্গ অভিহিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম প্রকীর্ণক। এই অধ্যায়ে বাগ্গেয়কারের ও গন্ধর্ব্বের লক্ষণ, (কলাবৎ ও নায়কাদির লক্ষণ), গায়ক, গায়কী, তাহাদের গুণ ও দোষ, শরীর ও শরীরের গুণ দোষ, নানাপ্রকার গমক, ছায়া, আলাপ ও বৃন্দাদির লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

চতুর্থ প্রবন্ধাধ্যায়। এ অধ্যায়ে ধাতু, ধাতুর অঙ্গ ও জাতি, শুদ্ধমূড় ও ছায়া লগভেদে প্রবন্ধের ত্রৈবিধ্য, আলিপ্রণালী, ও গীতের গুণদোষাদি বলা হইয়াছে।

পঞ্চম তালাধ্যায়। এ অধ্যায়ে মার্গ ও দেশী ভেদে তালের দ্বৈবিধ্য, মার্গতালের ক্রম, দেশীতালের ক্রম, পাত, গতি, কলা, গুরু-লঘু প্রভৃতির পরিমাণ, তাহার এককলত্বাদির প্রভেদ, পাদবিভাগের ব্যবস্থা, মাত্রা, তালনিপাতনের বিধান, অঙ্গুলি-নিয়ম, যুগল প্রভৃতি, পরিবর্ত্তনবিধি, লয়, যতি, গীত, ও গীতাঙ্গ। তদ্ভিন্ন দেশী তালের লক্ষণাদি নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ বাদ্যাধ্যায়। এই অধ্যায়ে নানাপ্রকার বাদ্য, বাদনপ্রকার ও ছন্দঃপ্রভৃতি অভিহিত হইয়াছে।

সপ্তম নৃত্যাধ্যায়। নৃত্যাধ্যায়ে নানাপ্রকার নৃত্য, শৃঙ্গার বীর করুণ প্রভৃতি নানাপ্রকার রস, সঞ্চারী ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব ও বিভাব প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

যাহা সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রধান প্রতিপাদ্য তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে রত্নাকরের প্রথমে

যে শরীরতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরবর্ত্তী নাদোৎপত্তি প্রকরণ সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

রত্নাকরলেখক শার্ঙ্গদেব শরীরসংস্থানের জ্ঞানকেও গানোপযোগী মনে করেন। তিনি বলিয়াছেন,—

গীতং নাদাত্মকং বাদ্যং নাদব্যক্ত্যা প্রশস্যতে।
তদ্দ্বয়ানুগতং নৃত্যং নাদাধীনমতস্ত্রয়ম্॥
নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্বচঃ।
বচসো ব্যবহারোঽয়ং নাদাধীনমতো জগৎ॥
আহতোঽনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে।
সোঽয়ং প্রকাশতে পিণ্ডে তস্মাৎ পিণ্ডোঽভিধীয়তে॥

যাহাই হউক, শরীরের সহিত ধ্বনিবিশেষের সম্বন্ধ থাকিলেও উহার জ্ঞানের সহিত গানের যে কোনরূপ উপযোগিতা আছে, তাহা আমাদের বোধে স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হয় না। সেই কারণে আমরা শরীরপ্রকরণ পরিত্যাগ করিয়া নাদোৎপত্তি প্রকরণেরই পরিচয় দিতেছি।

নাদ ব্রহ্ম।

গ্রন্থকার প্রথমতঃ নাদে ব্রহ্মধর্ম্মের আরোপ করিয়া উপাসনা করিতেছেন—

আমি সকল ভূতের চৈতন্য, জগদাকারে বিবর্ত্তিত, এরূপ আনন্দ ও অদ্বিতীয় নাদ-ব্রহ্মের উপাসনা করি। ১।

চিন্তাবিশেষের অর্থাৎ ধ্যানবিশেষের নাম উপাসনা। উপাসনাকাণ্ডীয় শাস্ত্রে উপাসনার অনেক প্রভেদ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে এক প্রকার উপাসনা—কোন এক পদার্থে অন্য এক মহিমান্বিত পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম (মহিমা) আরোপ করিয়া তদভেদে চিন্তা করা। এ প্রকার উপাসনা প্রতীকোপাসনা নামে প্রসিদ্ধ। রত্নাকরপ্রণেতা শার্ঙ্গদেব উক্ত পদ্ধতিক্রমে নাদে ব্রহ্মধর্ম্মের আরোপ করিয়া "নাদই ব্রহ্ম" এইরূপে উপাসনা করিলেন। শার্ঙ্গদেব দেখিলেন, চৈতন্য যেমন সর্ব্বপ্রকাশক, তেমনি নাদও পরিস্ফুট হইয়া সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক হয়; সুতরাং নাদে চৈতন্যধর্ম্মের আরোপ অসিদ্ধ হইবার নহে। চৈতন্যে ও ব্রহ্মে শব্দভেদ ব্যতীত বস্তুভেদ নাই। ব্রহ্ম জগদাকারে বিবর্ত্তিত, নাদও শ্রুতি-স্বরাদি সমুদায় শব্দপ্রপঞ্চাকারে বিবর্ত্তিত। তদনুসারে নাদে ব্রহ্মের বিবর্ত্তন ধর্ম্মের আরোপ সুসঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে। ব্রহ্ম মূল আনন্দ ও জগৎপ্রপঞ্চের অদ্বিতীয় কারণ। নাদও গীতাদিজনিত আনন্দের মূল ও সমুদায় বাক্‌প্রপঞ্চের অদ্বিতীয় কারণ। অতএব নাদে আনন্দধর্ম্মের ও অদ্বয়তার আরোপও সুসঙ্গত।

শার্ঙ্গদেবের অভিপ্রায়—নাদ ব্রহ্ম না হইলেও ব্রহ্মশক্তি বটে। অতএব নাদই ব্রহ্মোপাসনায় ঘনিষ্ঠ প্রতীক বা নিকট অবলম্বন।

নাদোপাসনায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, সকল দেবতাই উপাসিত হন। কেন না, তাঁহারা তদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মভূত। ২।

নাদোপাসনায় ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা তদভিন্ন ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দের উপাসনাও সম্পন্ন হয়।

উপাসনান্তে, যে প্রক্রিয়ায় বা যে প্রকারে শরীরে শারীরনাদের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয়, গ্রন্থকার তাহা নিম্নলিখিত বাক্যে বলিতেছেন।

আত্মার বিবক্ষা অর্থাৎ কিছু বলিবার ইচ্ছা হইলেই মন নিক্ষে প্রচলিত হইয়া দেহস্থ বহ্নিকে (তাপকে বা তাড়িতকে) প্রেরণ করে। সেই তাপ বা বহ্নি শরীরবায়ুকে (মতান্তরে স্নায়ুবিশেষকে) পরিচালিত করে। প্রোক্ত বায়ু ব্রহ্মগ্রন্থি হইতে (ব্রহ্মগ্রন্থি অর্থে নাভিকন্দ, মতান্তরে মূলাধার বা লিঙ্গমূল) ক্রমিক ঊর্দ্ধপথে গমন করতঃ নাভিস্থানে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, মূলপ্রদেশে ও মুখবিবরে ধ্বনি বা শব্দ জন্মায়। এই শব্দসামান্যের নাম নাদ। ৩।৪।

বলা হইল যে, নাদের আবির্ভাব বা উৎপত্তি স্থান নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা ও আস্য। বর্ণিত পঞ্চ স্থানের নাদ একরূপ না হওয়ায় তত্তৎস্থানীয় নাদের বিশেষ বিশেষ নাম বা সংজ্ঞা আছে। সে সকল সংজ্ঞা এই—

পঞ্চস্থানস্থিত নাদ যথাক্রমে অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্ট, অপুষ্ট ও কৃত্রিম, এই নামপঞ্চক ধারণ করে। ৫।

নাভিসমুৎপন্ন নাদ অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ অব্যবহার্য্য বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর। হৃদয়ে সূক্ষ্ম অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত স্থূল। কণ্ঠনাদ পুষ্ট, মূর্দ্ধন্যনাদ অপুষ্ট অর্থাৎ কিছু অস্পষ্ট। আস্যাবির্ভূত নাদ কৃত্রিম অর্থাৎ ইহাই পদ-পদার্থবোধক 'বাক্য'নামধেয়।

শরীরসমুত্থ শব্দের বা ধ্বনির নাদ নামটী যৌগিক অর্থাৎ শব্দদ্বয় যোগে উৎপন্ন। যথা—

ন—অক্ষর প্রাণবোধক এবং দ—অক্ষর অগ্নিবোধক। যেহেতু ন ও দ যোগে অর্থাৎ দেহস্থ প্রাণবায়ু ও বহ্নি (তাপ) উভয়ের যোগে (সংঘর্ষে) অভিব্যক্ত হয় সেই হেতু উহা নাদ শব্দে অভিহিত হয়। ৬।

নাদ নাভ্যাদি স্থানপঞ্চকে উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত হইলেও হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা এই তিন স্থানের নাদ গীতোপযোগী, অন্য দুই স্থানের নাদ গানব্যবহারের অনুপযোগী। উক্ত স্থানত্রয়স্থ নাদের ক্রমানুযায়ী সংজ্ঞা মন্দ্র, মধ্য ও তার। হৃদয়স্থ নাদ মন্দ্র, কণ্ঠ নাদ মধ্য এবং মূর্দ্ধণ্য নাদ তার। এই নাদত্রয় পর পর দ্বিগুণ উচ্চারণপ্রযত্নে (জোরে) জন্মলাভ করে। সেজন্য উহারা পর পর দ্বিগুণ উচ্চ। ৭।

বিশদ কথা এই যে, নাভিস্থানীয় ও আস্যস্থানীয় নাদ গীতশাস্ত্রীয় নিয়মের অন্তর্গত নহে। অবশিষ্ট ত্রিবিধ নাদ লইয়াই গান-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। অপর কথা এই যে, মন্দ্রস্থানস্থ ষড়্জাদি ভেদবিশিষ্ট (স রি গ ম প ধ নি, এই সপ্ত প্রভেদ) নাদ অপেক্ষা মধ্যস্থানস্থিত ষড়্জাদি সপ্তভেদের নাদ উচ্চতায় দ্বিগুণ এবং মধ্যস্থানস্থিত নাদ অপেক্ষা তারস্থানীয় নাদ উচ্চতায় দ্বিগুণ। উচ্চারণপ্রযত্ন দ্বিগুণ বলিযা উচ্চার্য্য নাদও দ্বিগুণ। ঐ দ্বৈগুণ্য আরোহকালে অনুভূত হইযা থাকে; অর্থাৎ মন্দ্র স্থানের স হইতে ক্রমে নি পর্য্যন্ত আরোহণ করিযা মধ্যস্থানের স এ আরোহণকালে যেরূপ আয়াসজনক প্রযত্ন প্রকটিত হয়, তুলনায় তাহা প্রথম উচ্চার্য্যমান স অপেক্ষা দ্বিগুণ। ঐরূপ মধ্যস্থানীয় স অপেক্ষা তারস্থানীয় স দ্বিগুণ। রি প্রভৃতি পক্ষেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

যেমন একই নাদ ষড়্জাদি সপ্তভাগে বিভক্ত, তেমনি উহা তদপেক্ষাও সূক্ষ্মবিভাগ দ্বাবিংশতি ভাগে বিভক্ত। সেই দ্বাবিংশতি ভাগের এক এক ভাগকে শ্রুতি আখ্যা প্রদান করা হয়। শ্রুতির ভাষানাম শোরৎ।

"স্থায়ী বা আস্থায়ী"

(রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল)

বাঙ্গালা দেশের গায়কদিগের মধ্যে 'আস্থায়ী' বলিয়া যে কথাটী প্রচলিত আছে, বস্তুতঃ উহা হওয়া উচিত 'স্থায়ী'। বহুকাল হইতে হিন্দুস্থানী গায়কেরাই গানের ওস্তাদ ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাঁহাদের উচ্চারণ দোষে 'স্থায়ী'—'আস্থায়ী' হইয়াছে, যেমন 'স্নান'—'আস্নান'। একবার গয়ায় একটী মঠধারীর মুখে 'আস্কন্দ' পুরাণ শুনিয়া আমার প্রথমে ধাঁধা লাগিয়াছিল। পরে বুঝিলাম যে, 'স্কন্দ' তাঁহার মুখে 'আস্কন্দ' হইয়াছে। এ দোষ যে আমাদের দেশে একেবারেই নাই, তাহা নয়। 'আস্ক'-ফলা, 'আস্ক' ফলা—এগুলি 'স্ক'-ফলা, 'স্ক'-ফলার অপভ্রংশ। এই যে বাঙ্গালীর ছেলেরা বলে—'ইস্কুলে' যাব, কিন্তু তাহারা যায় 'স্কুলে'। এইরূপে সঙ্গীতের প্রথমাঙ্গ, যাহা সংস্কৃতে 'ধ্রুব' বলিয়া বিখ্যাত তাহাই 'স্থায়ী'। কিন্তু হিন্দুস্থানী ওস্তাদের মুখে তাহা আস্থায়ী হইযা যাওয়ায় বাঙ্গালী গায়কগণ আজও সেই 'আস্থায়ী' ব্যবহার করিতেছেন। এমন কি 'প্রকৃতিবাদ', 'বিশ্বকোষ' প্রভৃতি অভিধানকারেরাও বিনা বিচারে গায়কদের ঐ 'আস্থায়ী' গ্রহণ করিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি "মানসী"তে এই প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলাম, তাহার পর হইতেই দেখিলাম শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা—যিনি প্রায় সকল মাসিক-পত্রিকাতেই স্বরলিপি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র তিনিই 'আস্থায়ী' ত্যাগ করিযা 'স্থায়ী' গ্রহণ করিয়াছেন। বড় বড় গায়কের কাছে এখনও এ প্রসঙ্গ পৌঁছায় নাই। তাঁহারা এখনও 'আস্থায়ী' চালাইতেছেন।*

পত্রাবলী

(১)

ওঁ পিতা নোঽসি।

"আনন্দ-মিলন"
পোঃ কৃষ্ণনগর—নদীয়া।
১০।৫।০৩

বিনয়-নমস্কারপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন,—

আপনার সম্পাদিত "তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা" সমস্ত

---

* এ বিষয়ে সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে আলোচনা প্রার্থনীয়।

সময়ে আমার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় এবং উহার রচনাবলী পাঠ করিয়া প্রীত হই। সাম্প্রদায়িকতার বিসর্পক্ষত ঐ পত্রিকাকে জর্জ্জরীভূত করিতে পারে নাই, ইহাই আমার অশেষ আনন্দের কারণ। ভেদবুদ্ধির বিষাক্ত কজ্জলে 'তত্ত্ববোধিনী'র বিচার দৃষ্টি খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাও আমাকে আনন্দ দিয়াছে।

"তত্ত্ববোধিনী"র প্রথম সম্পাদক বোধ হয় স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তই ছিলেন; তাঁহার সেবিত 'তত্ত্ববোধিনী'ও আমার দেখা আছে। একাল পর্য্যন্ত যে যে মহারথী ঐ পত্রিকার কর্ণধার হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই সেবা-পরিচয়ের তথ্য এক-আধটু জানি। গত কয়েক বৎসর হইতে আপনিই "তত্ত্ববোধিনী"র প্রধান কাণ্ডারী। বলা বাহুল্য, আপনার শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবাপ্রবৃত্তিতে বঙ্গভারতী সন্তুষ্টা হইয়া আপনার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক বিবিধ পুস্তকরচনা ও পত্রিকাসম্পাদনে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন; সাময়িকপত্র সম্পাদক-যূথ মধ্যে আপনার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার্য্য নহে।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, "তত্ত্ববোধিনী" যে সাম্প্রদায়িকতার জঘন্য দৌর্ব্বল্যে কম্পিত নহে, এজন্য আমি আনন্দিত। অধুনা সাময়িক বা সাপ্তাহিক পত্রিকাদির অধিকাংশই কোনও একটি দলবিশেষের জয়ঢক্কা মাত্র। অপরের গ্লানি এবং কুৎসা প্রচার করিবার দুঃখজনক কুপ্রবৃত্তির অন্ধ কৈঙ্কর্য্য (দাসত্ব) বহু সাময়িক বা সাপ্তাহিকের উপজীব্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা! আপনি 'তত্ত্ববোধিনী'র পুরোভাগে একমাত্র ব্রহ্মকেই প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন,—কোনও দলের নেতাকে নহে—ইহা বড়ই আনন্দের কথা। ব্রহ্মই তত্ত্বস্বরূপ। "তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে" ইহাই ব্রহ্মজ্ঞগণের মর্ম্মবাণী। আপনার কাগজখানিকে সেই ব্রহ্মরসানন্দের অক্ষয় প্রস্রবণরূপে দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? সংসারের সকল রস ব্রহ্মের রসাভাসে রসযুক্ত হইয়াছে,—কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে তাহা বুঝিতে পারে না, আর বুঝে না বলিয়াই খণ্ড-রস-মূর্ত্তিকে একান্ত ভাবে সর্ব্বময় ভাবিতে গিয়া এবং তাহাকে আপনার আয়ত্তে আনিতে গিয়া কতই না বিরোধ-বিপ্লবের সূচনা করে! সেই নিত্যানন্দ জগদীশ্বর কখনই তো খণ্ড নহেন; আর খণ্ড নহেন বলিয়াই অনন্ত শান্তিসুখের অক্ষয় মধু-পাত্র তাঁহাতেই নিহিত আছে। "তত্ত্ববোধিনী"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি—যাহা ঐ পত্রিকার প্রথমেই বাহির হয়—সেই নিত্যানন্দের শাশ্বত বার্ত্তা বহন করে বলিয়াই রসগ্রাহী ব্যক্তিগণকে পরম হর্ষাশ্রুতে পরিপ্লুত করিয়া দেয়। বিষয় কালকূট দষ্ট উদ্ভ্রান্ত-যৌবনকালে নাকি ভগবৎ-বিষয়ক কথায় অনেকের রুচি হয় না। কিন্তু আপনার লিখিবার কৌশলে ঋষিগণের ধ্যেয় ব্রহ্মরহস্য, রসাল ও মাধুর্য্যপূর্ণ হইয়া সকলেরই হৃদয় আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। আপনার হৃদয়ে প্রগাঢ় সাহিত্যপ্রীতি সঞ্চিত থাকায় এবং তত্ত্বে ও সাহিত্যে মিশাইয়া 'ভিয়ান' করিতে পারায় কঠিনকে সহজ করিয়াছেন এবং দূরকে নিকট করিতে পারিয়াছেন।

এদেশে প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যদশায় বহু সুশিক্ষিত ব্যক্তিও ভোগের বলীবর্দ্দ-রূপে কালযাপন করেন এবং সুদুর্লভ মনুষ্যত্বের অপব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত নহেন। এরূপ ক্ষেত্রে আপনি যেরূপ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত পত্রিকাখানিকে শ্রদ্ধাযুক্ত মনে পরিচর্য্যা ও সেবায় ঋদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন, একমাত্র সাহিত্য আরাধনাই জীবনব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকা যায় না। আপনার এই ব্রত উদ্‌যাপিত হউক, ইহাই প্রার্থনা করি।

বিনীত

শ্রীনারায়ণ ভারতী।

(২)

কৃষ্ণনগর।

২৩।৮।২৬

প্রীতিভাজনেষু—

আপনার ২২।৮ তারিখের পত্রখানি পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। শ্রীমতী বাণীদেবী আপনার কন্যা শুনিয়া আরও আহ্লাদিত হইলাম। শ্রীমতীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

* * * *

"তত্ত্ববোধিনী" আসিলেই না পড়িয়া ফেলিয়া রাখি না এবং অন্যকেও পড়িতে দিই।

পত্রের সঙ্গে যে "বন্ধনী"টী আপনি পাঠিয়েছেন, তার ফাঁদ বড় হলে মস্তকেও বাঁধিতাম জানিবেন। পরম আদরে আপনার প্রদত্ত রাখী-বন্ধনী গ্রহণ ও হস্তে ধারণ করিলাম। সাহিত্যের সূক্ষ্ম সূত্রে কি সুবিমল ও সুন্দর আমাদের এই বন্ধুত্বের বন্ধন ঘটিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই অক্ষয়-বন্ধন।

আপনার রাখীভ্রাতা

শ্রীদীননাথ।

(৩)

কুমিল্লা।

২৭।৮।২৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রিয় আচার্য্য মহাশয়—

আপনার ২১।৮ তারিখের আশীঃ ও প্রীতিপূর্ণ পত্র-

খানা পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। ভগবানের কৃপায় ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে মেয়ের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় মনে একটী বেশ শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতেছি। বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই সম্বন্ধের প্রস্তাব চলিতেছিল; কিন্তু নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নের জন্য এবং আমাদের মতের মিল না হওয়ায় বিবাহ হইতে পারে নাই। বিবাহের পূর্ব্বে কত ভয়-ভাবনা ছিল; আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব বিবাহ আইনসঙ্গত হইবে না, সমাজচ্যুতি ইত্যাদি কত প্রকার ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন। কত দুর্ভাবনা, উদ্বেগ ও আশঙ্কা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু যেই কার্য্য সমাধা হইল অমনি ভগবানের করুণায় সমস্ত মেঘ ও অন্ধকার কোথায় চলিয়া গেল; বাহিরের ও ভিতরের আকাশ দুইই পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি হিন্দুসমাজে থাকিয়া নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদ-সম্মত হিন্দুমতে যে সুপাত্রে মেয়েকে অর্পণ করিতে পারিয়াছি, ইহাতে প্রাণে অত্যন্ত শান্তি পাইতেছি। আপনাদের সাহায্য ও সাহস না পাইলে আমি এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না। আজ হৃদয় ভরিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আপনাদের সহিত যে একটী ধর্ম্মের যোগ সংস্থাপন হইল তাহা চিরদিন থাকিবে। আমি আশা করি যে এই বন্ধন রক্ষা করিতে সর্ব্বদা আপনার সদুপদেশ ও সাহায্য পাইব। আপনাদের সমাজের সভ্য হওয়ার যদি আমার উপযুক্ততা থাকে তাহা হইলে আমাকে সভ্যশ্রেণীতে গ্রহণ করিলে সুখী হইব। আমি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক হইতে প্রস্তুত আছি; আপনি আপনাদের কর্ম্মচারীকে পত্রিকা আমার নামে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইতে বলিবেন।

আপনি যে কয়েকখণ্ড অমূল্য পুস্তক উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। এই পুস্তক পাঠে আমার অনেক উপকার হইবে। আপনাকে এই পুস্তকের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। * * *

আমাদের নিজের কুলপুরোহিত বিক্রমপুর বাসাইল পণ্ডিতসমাজের লোক। তিনি এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন এবং বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রসম্মত ও বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

আশা করি আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। আপনি আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীত

শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু।

গ্রন্থ-পরিচয়।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ (দ্বিতীয়ার্দ্ধ)—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত এবং সম্পাদিত। ডবল ক্রাউন আকারে ২৭২+২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বর্ণমণ্ডিত বাঁধাই সুন্দর, ছাপা ভাল; কাগজ মধ্যম। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বিগত চৈত্রসংখ্যা-পত্রিকায় ইহার প্রথমার্দ্ধের পরিচয়-প্রসঙ্গে আমরা ছান্দোগ্যের এই বর্ত্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিয়াছি—এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না। এই দ্বিতীয়ার্দ্ধে পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত শেষ চারি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যায়গুলি প্রধানত 'সংবাদ' অর্থাৎ পরস্পর-কথোপকথনমূলক কতকগুলি আখ্যায়িকায় পূর্ণ। এই আখ্যায়িকাগুলিতে ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় স্তর অর্থাৎ প্রধানত নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটী খণ্ড আছে। ইহাতে অন্যান্য অবান্তর বিষয়ের সহিত 'শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদে' ঔপনিষদ পরলোকতত্ত্বের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'আরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদে' প্রথমতঃ একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়া শেষে বিবিধ লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে 'তত্ত্বমসি' এই ঔপনিষদ মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে 'নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে' ঋগ্বেদাদি-'নাম' হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষি সনৎকুমার ক্রমোচ্চ সোপানপরম্পরা অতিক্রম পূর্ব্বক পরমতত্ত্ব ভূমাতে উত্থিত হইয়াছেন। অষ্টম অধ্যায়ে 'প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে' দেহাত্মভ্রম ও স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি অবস্থার তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

বেদান্তরত্ন মহাশয়ের 'মন্তব্য'গুলি যে বাঙ্গালা ভাষায় একান্ত অভিনব ও বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে, তাহা আমরা প্রথমার্দ্ধের সমালোচন-কালেই স্বীকার করিয়াছি। ব্যাকরণবিষয়ক সূক্ষ্ম বিচারপ্রসঙ্গে তাঁহার ভাষাতত্ত্বমূলক গবেষণাগুলি সুন্দর। ব্যাখ্যাত অংশের সদৃশ শব্দ, ভাব ও আখ্যায়িকার সংগ্রহ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের প্রগাঢ়তার নিদর্শন।

তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের দ্বাদশ পৃষ্ঠাব্যাপী উপনিষদুক্ত সাধনপ্রণালীর আলোচনায় বেশ মৌলিকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গেল। উপনিষদের সাধনা প্রধানতঃ জ্ঞানসাধনা, তথাপি বৃহদারণ্যক হইতে তিনি প্রেমসাধনারও যে নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে জানা থাকিলেও ব্যাখ্যাগুণে অভিনব বোধ হইল। সুদূর আরণ্যকযুগের এই গ্রন্থখানির সহিত পাঠকদের পরিচয়-সাধনে সম্পাদক 'মুখবন্ধে' যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া-

ছেন, তাহা সুন্দর; তবে আলোচনা এত সংক্ষিপ্ত না হইয়া আরও দীর্ঘতর হইলে ভাল হইত।

সু. চ. বে.

আর্ট ও সাহিত্য—সুলেখক শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "আর্ট ও সাহিত্য"-শীর্ষক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম, পাঠ করিয়া পবিত্রগন্ধপূর্ণ গৃহে সহসা প্রবেশ করিয়া যেরূপ আরাম ও আনন্দ পাওয়া যায় তদনুরূপ একটু পবিত্র আমোদ পাইলাম। তিনি দেখাইয়াছেন যে আমাদের জাতীয় সাহিত্য-ছাঁচের কোনও চর্চা বা আদর নাই। তাহা সত্য! এমন কি, উপন্যাস-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও অনেক স্থলে বিদেশী-ছাঁচে তাঁহার উপন্যাসগুলি তৈরী করিয়াছেন। জাতীয় সমাজের উন্নতিকল্পে জাতীয় ভাষা ও ভাবের অভিব্যক্তি একান্ত আবশ্যক। তৎপরে তিনি দেখাইয়াছেন যে উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্য একটী আর্টের অভিব্যক্তি, যে আর্ট এক গবেষণাপূর্ণ আর্ট—যে আর্টের ভিতরে জাতীয় ভাব ও ভাষার পূর্ণ বিকাশ হওয়া চাই এবং তাহার ভিত্তি "সত্য" অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান। ভগবানকে বাদ দিয়া আর্ট চলে না—ভগবানহীন আর্ট আর্ট নয়; যে আর্ট সমাজ নীতি ও জাতীয় ভাব-সংরক্ষক, তাহাই প্রকৃত আর্ট। আর্টের ভিতরে "সত্যং শিবং সুন্দরং" এই ভাব প্রতিফলিত করিতে হইবে।

মোটের উপর এই পুস্তকখানিতে দেশের শিল্পশিক্ষার বিশেষ সহায়তা লাভ হইবে এবং সুধীমাত্রেরই আদরের হইবে। ঠাকুরপরিবার এদেশের আদর্শস্থানীয়, তাঁহারা ধনে মানে ও চরিত্রে এবং শিক্ষায় দেশের মধ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সুচিন্তিত বিষয়ে লোকের মন আকৃষ্ট হইবে। সকলেরই ইহা পাঠ করা একান্ত উচিত। পুস্তকখানি ১৮৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত, লিখা ও কাগজ পরিষ্কার, উত্তম বাইণ্ডিং, প্রাপ্তিস্থান আদিব্রাহ্ম-সমাজ-কার্য্যালয়, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

কাশীপুর-নিবাসী—২৬শে বৈশাখ, ১৩৩০।

SRI BHAGABAT KATHA—By Kshitindra Nath Tagore Published By Hari Sankar Mukerjie From 5-1 B, Baranashi Ghose Second Lane, Calcutta, Price Eight Annas.

There is little doubt that a healthy education must not only include physical and intellectual training but must also help the development of the spiritual side of man. But somehow or other this fact is generally neglected in the education of our children and the result has been manifest in the daily-growing tide of atheism and irreligiosity in our society. To check this our march towards a godless state it is necessary that the yet plastic mind stuff of the child be impressed with the elements of religion, the idea of God.

The problem of a suitable text book for the child has been well met by Sj. Kshitindra Nath Tagore (the grandson of Maharshi Devendra Nath) and the little volume under review eminently fulfils the purpose for which it was written. It is complete in seven lessons which lucidly explain in simple Bengali the reasons which compel our belief in the existence of God and this attributes. One great merit of the book is that it is written from a purely nonsectarian standpoint, and is just the book suitable for adoption as a text book in schools for boys and girls in Bengal.

The book will prove profitable reading to grown up people as well, helping the mystic, agnostic or the atheist to systematise, reason out or overhaul his faith in God or unfaith as the case may be.

Forward 19-9-26.

ওপারে—লেখকের নাম উল্লেখ নাই। ইহা একখানি আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—"কোন সুদূর পল্লীগ্রামে এক ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি "পরলোকযাত্রী" বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। কিছু ঘনিষ্ঠতা হইবার পর তিনি আমার নিকট তাঁহার "পরলোকযাত্রার" কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে তিনি অর্দ্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় নিজের শরীরকে ইহলোকে ফেলিয়া রাখিয়া লোকলোকান্তরে ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন, আগাগোড়া সমস্তই বর্ণনা করিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। তিনি চলিয়া গেলে আমি সদ্য সদ্য সেই বর্ণনাগুলি যথাসম্ভব তাঁহারই ভাষায় লিখিয়া ফেলিলাম। গ্রন্থের সত্যমিথ্যা যাহা কিছু তাহা তাঁহারই।" ওপারের যাত্রী তাঁহার পরলোককাহিনীতে জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে যেরূপ সরল ও সহজভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। উপনিষদের

সহিত গ্রন্থোল্লিখিত অনেক কথারই মিল আছে। তবে একটী প্রধান অমিল এই যে, উপনিষদে চন্দ্রলোকের পর ব্রহ্মলোক অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু "ওপারের" যাত্রী বলেন, সূর্য্যলোকের পর ব্রহ্মলোক। তারপর বৈজ্ঞানিকদের যুক্তি লইয়া সত্যনির্দ্ধারণ করিতে গেলে চন্দ্রলোককে জীবনিবাসের অযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পরলোকযাত্রী চন্দ্রলোককে জীবনিবাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্বেত্তা ফ্লামরিয়ঁর মঙ্গলগ্রহ অপেক্ষা চন্দ্রলোকই জীবের বাসস্থানের পক্ষে অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সেই হিসাবে পরলোকযাত্রীর কথাগুলি বৈজ্ঞানিকের কষ্টিপাথরেও টিকিবে বলিয়া আমাদের মনে করা অসমীচীন নহে। এই গ্রন্থখানির ভাষা ও লিপিকুশলতা এমনই চিত্তাকর্ষক যে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। আমরা জনসাধারণকে পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। দাম ৸০ আনা। ঢাকাপ্রকাশ—১৭ই পৌষ, ১৩২৮।

সংবাদ।

অধ্যক্ষসভা।—বিগত ৯ই আশ্বিন রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ম ঘটিকার আদিব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল-গৃহে অধ্যক্ষসভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত মুন্সেফ ও ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগামী কার্ত্তিকসংখ্যায় আমরা এই সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিব।

শোক-সংবাদ।

৺ধর্ম্মদাস বসু—অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন কর্ণেল ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় গত ৪ঠা আশ্বিন মঙ্গলবার পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম অশীতিবর্ষ হইয়াছিল। এই স্বনামধন্য গুণবান পুরুষ আপন চরিত্রোৎকর্ষে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধার ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্রপরিজনদিকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সুগতি বিধান করুন। এই সূত্রে আমরা তাঁহার প্রতি একটী বিষয়ে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইনি কলেরার ঔষধরূপে ইন্দ্রযবের গুঁড়া ব্যবহার করিতেন। উহা ব্যবহার করিয়া আমরা বিশেষ ফল পাইয়াছি।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি যে, আদিব্রাহ্মসমাজের অনুরক্ত ও হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সমাজের হিতার্থে এককালীন ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ঢাকানিবাসী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত শ্রাবণ মাসে তাঁহার পুত্র শ্রীমান সুধীরচন্দ্রের বিবাহোপলক্ষে এককালীন ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কুমিল্লাপ্রবাসী শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু মহাশয় গত শ্রাবণ মাসে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী পদ্মিনী দেবীর বিবাহোপলক্ষে এককালীন ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভ্রমস্বীকার।

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, গত ভাদ্র-সংখ্যা পত্রিকায় 'শোক-সংবাদে' 'কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়' স্থলে ভ্রমক্রমে 'কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ সেন' লিখিত হইয়াছে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৯ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭৬ অঞ্জলি। রুদ্র দেবতা।

১। হে ভগবান পরমপুরুষ! তুমিই আমাদের পূজার একমাত্র পাত্র। আমরা একমাত্র তোমাকেই ভজনা করি। সর্ব্বত্র আমরা তোমারই জয়ধ্বনি করি। সুপ্ত আত্মা তোমাকে লাভ করিতে পারে না। আমাদের আত্মাকে তোমার প্রতি সর্ব্বদাই জাগ্রত রাখ। তোমাকে ছাড়িয়া অন্য কোন দেবতাকে যেন আমরা স্তুতিবাদে ভুলাইতে অগ্রসর না হই।

২। হে সকল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আকর! তুমি আমাদিগকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত গো অশ্ব প্রভৃতি পশু প্রদান কর। তুমি আমাদের গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ কর। তুমি আমাদিগকে যে ধনরত্নের এবং যে জ্ঞানধর্ম্মের উত্তরাধিকারী করিয়াছ, আমরা যেন নিজেদের দোষে সে সকলের অপব্যবহার না করি, সে সকল যথাযুক্তরূপে রক্ষা করি। তুমিই আমাদের জ্ঞানদাতা গুরু। তুমিই আমাদের চিরপুরাতন গৃহদেবতা। তুমিই আমাদের চিরন্তন সখা ও সুহৃৎ। তুমি আমাদের কাতর প্রাণের প্রার্থনাসকল সফল কর। আমাদের হৃদয় হইতে তোমারই নামে জয়ধ্বনি উত্থিত হউক।

৩। তুমি প্রজ্ঞানঘন। তুমি সমস্ত সংসারধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তুমিই সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান পরমেশ্বর। বিশ্বজগতে যত কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, সে সকলের আকর তুমিই। তোমার প্রতি যাহাদের আস্থা নাই, সেই সকল অশ্রদ্ধাবান ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি তোমারই মঙ্গলবিধানে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা তোমাকে চাই—তুমি আমাদের এই প্রার্থনা ব্যর্থ করিও না। আমাদিগকে তুমি আপনাকে দিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

৪। তুমি আমাদের নেতা, তুমি আমাদের রাজা। আমরা তোমারই প্রজা। আমাদের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। গো, অশ্ব ও ধনধান্য প্রচুর পরিমাণে দিয়া আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে বিমুক্ত কর। আমাদিগকে শক্তি দাও, যাহাতে পরস্বাপহারী চৌর দস্যু প্রভৃতিকে যথাযথ দণ্ড প্রদান করিয়া সুপথে আনিতে পারি। আমাদিগকে বল দাও, যাহাতে আমরা আমাদের উপার্জ্জিত ধন শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া সন্তানসন্ততিকে যথোপযুক্তরূপে লালনপালন করিতে পারি।

৫। হে রক্ষকদিগের রক্ষক! তুমি আমাদিগকে অন্নবস্ত্রের অভাব হইতে মুক্ত কর। তুমি আমাদিগকে সুমিষ্ট জলের অভাব হইতে মুক্ত কর। আমাদিগকে স্বাস্থ্য প্রদান কর, যাহাতে আমরা তোমার অপার মহিমাচিন্তনে সমর্থ হই। তুমি আমাদের অন্তরে সুমতি প্রদান কর, যাহাতে আমরা জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করি এবং ধনরত্নের

অধিকারী হইয়া তোমার আদেশে জগতের মঙ্গল সাধনে তাহা প্রয়োগ করি।

৬। হে দেবদেব! আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের বংশের প্রত্যেকেই যেন সাধুগণের রক্ষণে যত্নবান হয়। তোমার প্রিয়কার্য্য জানিয়া আমাদের সন্তানেরা যেন বংশানুক্রমে সৎপথে চলিতে থাকে। তাহারা যেন তোমার উপাসনাকেই জীবনের মন্ত্ররূপে ধারণ করে এবং শতসহস্র দুঃখ বিপদ অতিক্রম করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করে।

৭। যে দেশে, যে জাতিতে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, হে রাজরাজ! তুমি সেই দেশে ও সেই জাতির মধ্যে তোমার রুদ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও এবং সংহার-অগ্নিতে অধর্ম্মের আবর্জ্জনা ভস্মীভূত করিয়া নবতর ভাব ও নবতর শক্তি প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর। অধর্ম্মের কারণেই বশিষ্ঠ তোমাকে সহায় লাভ করিয়া প্রবলপরাক্রান্ত বিশ্বামিত্রকেও পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন।

৮। অধর্ম্মের কারণেই তোমার মঙ্গল বিধানে কৌরবেরা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অধর্ম্মের কারণেই তোমার মঙ্গলবিধানে তোমার প্রিয় এই পুণ্যভূমিও পরাধীনতার শৃঙ্খল ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

৯। এখন আমরা অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের বিরুদ্ধে শত শত অস্ত্র সজ্জিত হইয়া আছে। দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের আমরা কোনও উপায় দেখি না। তুমি তোমার মঙ্গলচক্রের দ্বারা সেই সকল অস্ত্র বিখণ্ডিত করিয়া দাও এবং আমাদিগকে উন্নতির পথে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত কর।

১০। হে ভগবান! তুমি আমাদের প্রিয় সমাজকে তোমার স্নেহপ্রেমে নিত্যকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছ। জননীর ন্যায় তুমি আমাদের পিতৃপিতামহগণকে কত না যত্নে লালনপালন করিয়াছিলে। আমাদিগকেও তুমি বর্ম্মদুর্গ হইয়া ঘিরিয়া আছ। অদ্যাপি তুমি আমাদিগকে বিপদে আপদে দুঃখে শোকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ। তোমাকে নমস্কার।

১১। তুমি সর্ব্বশক্তিমান। তুমিই মহৈশ্বর্য্যবান। আমরা তোমার বিজয়পতাকা স্কন্ধে বহন করিয়া তোমার এই ধর্ম্মক্ষেত্রে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। আমরা তোমারই যশোগান করিতেছি। যত দেবমনুষ্য তাহা অবাক হইয়া শুনিবার জন্য এখানে উপস্থিত। তুমি মঙ্গলস্বরূপ। তুমি সকলের মঙ্গলবিধান কর। তুমি আমাদিগকে আয়ু বল ও ধন দাও, যাহাতে আমরা সংসারে সুখে বিচরণ করিতে পারি। তুমি আমাদের বংশকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান সন্তানসন্ততি দ্বারা সমুজ্জ্বল কর। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৭৭ অঞ্জলি। রুদ্র দেবতা।

১। হে পাপহরণ! আমরা যেন তোমার আদেশের বিরুদ্ধে না চলি। তোমার রুদ্রমূর্ত্তি যেন আমাদিগকে দেখিতে না হয়। তোমার ভয়ে প্রকৃতি যথানিয়মে কার্য্য করিয়া চলিতেছে। তোমারই ভয়ে মৃত্যুও সঞ্চরণ করিতেছে। তুমি অমৃতপুরুষ। আমরা তোমার সন্তান। আমাদিগের অন্তরে বল দাও, যাহাতে আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারি।

২। তুমি সর্ব্বশক্তিমান। তুমি প্রজ্ঞানঘন। আমরাও যেন শক্তিতে, জ্ঞানেতে ও প্রেমেতে উন্নত হইয়া তোমার চরণস্পর্শের অধিকার লাভ করি। তুমি আমাদের অন্তরে বল প্রদান কর, যাহাতে আমরা রিপুগণকে জয় করিয়া তোমার এই বিশ্বভুবনকে সমলঙ্কৃত করিতে পারি। তুমি আমাদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ দাও, যাহাতে আমরা দেহে মনে সবল হইয়া তোমার সঙ্গে নিত্য যোগযুক্ত হই।

৩। তুমি আমাদিগকে সকল ক্ষেত্রে বিজয় বিধান কর। আমরা যেন দৃঢ় পদে অগ্রসর হইয়া শত্রুদিগের পরাজয় সাধন করিতে পারি। তুমি দেদীপ্যমান পরমেশ্বর। আমাদিগকে দিকে দিকে তোমারই মহদ্‌যশ ঘোষণা করিবার শক্তিসামর্থ্য প্রদান কর। তুমি তোমার অপ্রতিহত বলে বিশ্বভুবন ধারণ করিয়া আছ। তুমি আমাদের সেনাপতি। তুমি আমাদের কাম্যবস্তুসকল বিধান কর। তুমি সুখকর ও কল্যাণকর। তুমি আমাদের সুখ ও মঙ্গল বিধান কর।

৪। এই মহান আকাশ তোমার সিংহাসন। যাহারা অন্তরে তোমার প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয়

পোষণ করে, তাহারা তোমারই মঙ্গল বিধানে শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহারা আমাদের উপর বিজয়লাভ করিবে কিপ্রকারে ?

৫। তোমার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে। তোমার ভয়ে বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে। তোমার অনিমেষ নয়ন আমাদের স্বপ্নে ও জাগরণে নিয়তই মঙ্গলবিধানে নিরত রহিয়াছে। তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তুমি রক্ষকদিগেরও রক্ষক।

৬। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রসংগ্রামে তুমি ভক্তিমান ও শ্রদ্ধাবান বশিষ্ঠকে বিজয় প্রদান করিয়াছিলে এবং উদ্ধত ও গর্বিত বিশ্বামিত্রকে পরাজয় প্রদান করিয়া তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলে। পাণ্ডব-কৌরবযুদ্ধে তুমি ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবদিগেরই সহায় হইয়াছিলে। অধার্ম্মিক ও দুর্নীতিপরায়ণ কৌরবেরা তোমার বজ্রদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। আমরা তোমার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়াছি। শত বিরোধবিপ্লবের মধ্যেও তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ। যাহারা তোমা হইতে দূরে থাকিতে চায়, তোমার রুদ্রমূর্ত্তি সেই সকল গর্বোদ্ধত ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচারী মানবের মধ্যে কি ভীষণ ভাবেই না প্রকাশিত হয়!

৭। আমরা তোমার গুণগান করি। আমাদের যাহা কিছু, সকলই তোমার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। অশ্রদ্ধা, অসাধুতা, সংশয় ও অধর্ম্ম হইতে আমরা সর্ব্বদাই দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। তোমারই প্রদর্শিত পথে আমরা সর্ব্বদাই বিচরণ করিতে চাই। তুমি আমাদের সহায় হও। আমাদের দেশে মেঘ যথা-সময়ে বারি বর্ষণ করুক এবং মাতা পৃথিবী ভূরি শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন।

৮। তোমার শক্তি কেহই পরিমাণ করিতে পারে না, এবং কেহই তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না। তুমি জ্ঞানস্বরূপ। তোমারই জ্ঞানের কণামাত্র লাভ করিয়া দেবমনুষ্য সকলেই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত কেহই সে জ্ঞানের অন্ত পায় নাই। আমাদিগকে তোমার শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম বিশ্বজগতে ঘোষণা করিবার উপযুক্ত করিয়া লও।

৯। আজ আমরা হৃদয়ের যে প্রীতিকুসুম তোমার চরণে নিবেদন করিতেছি, তাহা তুমি প্রেমসিক্ত করিয়া গ্রহণ কর। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দাও, আমাদের মঙ্গল ইচ্ছাসকল যেন সফল হয়।

১০। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে বিপদের ঘন অন্ধকার আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে; তোমার মঙ্গলজ্যোতি তাহা বিদূরিত করিয়া দিক। আমাদের অন্তরে দুঃখশোক যে কৃষ্ণবর্ণ ছায়া ফেলিয়াছে, তোমার জ্ঞানজ্যোতি তাহা দূর করিয়া অন্তরকে আলোকিত করিয়া তুলুক।

১১। হে মহান পরমেশ্বর! তুমি আমাদের যশ ও কীর্ত্তি দিগন্তবিস্তৃত কর এবং চিরস্থায়ী কর। তুমি আমাদিগকে শক্তিসামর্থ্য প্রদান কর, যাহাতে আমরা শত্রুদের কলকৌশল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সংসারে বিজয়ীর বেশে বিচরণ করিতে পারি। তুমি আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা প্রকৃতিতে তোমার আশ্চর্য্য স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, এবং আত্মাতে তোমার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আমাদিগের যোগক্ষেম তুমিই বহন কর। আমাদের অন্নজলের কষ্ট বিদূরিত কর। আমাদিগকে সুখসমৃদ্ধি প্রদান কর। আমাদের বংশে যে সকল পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, তোমার প্রতি তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন অটুট থাকে।

বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনবিষয়ক আরও কয়েকটি কথা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৯৬। ক'বে আসেন ?

মুলো পঞ্চানন বলেন যে ৯৯৯ সম্বতের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের পুষ্যানক্ষত্রে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে রাজা আদিশূরের আহ্বানে বঙ্গদেশে আগমন করেন (১)। কিন্তু ভট্টগ্রন্থে আছে, ৯৯৪ শকে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন (২)। আমরা কিন্তু ইতিপূর্ব্বে

(১) স৹ নি৹ ৩২৬—৩২৭পৃঃ।

(২) ব্রা৹ কা৹ ২৭পৃঃ এবং Tagore Family পৃঃ ৪।

আলোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, উ্রই সিদ্ধান্তের মূল বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পাঠ বিশুদ্ধ নহে। "ঠাকুর পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ"-লেখক তো এ বিষয়ে কোনও প্রমাণই দেন নাই, যদিও তিনি ভাটের কথার উপরেই নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, ৯৯৪ শকের (অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দের বা ১১২৯ সম্বতের) কার্ত্তিক মাসে শুক্ল নবমী তিথিতে বৃহস্পতিবার ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। ৯৯৯ সম্বত হইতে ১১২৯ সম্বতের ব্যবধান হইল ১৩০ বৎসর—প্রায় ৪ পুরুষের ব্যবধান। আদিশূর হইতে চারি পুরুষ পরে আমরা প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূরের আবির্ভাব দেখি (৩)। গৌড়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে "কুলাচার্য্যগ্রন্থ এবং প্রাচীন কুলাচার্য্যদিগের কথা" অনুসরণ করিয়া ইহাই সমর্থিত হইয়াছে (৪) দেখি। কোন কোন কুলগ্রন্থে, বিশেষতঃ বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রে, আদিশূর হইতে চারি পুরুষ পরে না ধরিয়া তৃতীয় পুরুষে প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্রের আবির্ভাব ধরা হয় (৫)। বিপ্রকুলকল্পলতায় প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্র আদিশূরের জামাতা ত্রিভুজ সেনের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (৬)। "বরেন্দ্রকুলশাস্ত্রগ্রন্থে এ বিষয়ে আরও একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আদিশূরের পর ভূশূর এবং তৎপরে বরেন্দ্রশূর ও প্রদ্যুম্নশূর নামে দুই ভ্রাতা রাজা হন। তাঁহাদের সময়ে বিপ্লব সংঘটিত হইয়া বরেন্দ্র এক দেশে ও প্রদ্যুম্ন অন্য দেশে রাজ্য স্থাপন করায় কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের নামানুসারে বরেন্দ্রদেশ ও প্রদ্যুম্নের রাজ্য রাঢ়দেশ নামে খ্যাত। বাসস্থানের নামানুসারে কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা জনশ্রুতি মাত্র" (৭)। কিন্তু কুলতত্ত্বার্ণবে আছে যে, ভূশূর যখন ধর্ম্মপালকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন, সেই সময়ে তাঁহারই সঙ্গে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের ২৩ পুত্রের মধ্যে (আমরা কিন্তু দেখিয়াছি ৫৬ পুত্র) ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পাঁচ ব্রাহ্মণই রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন এবং পরে তাঁহাদেরই বংশধরেরা রাঢ়ী আখ্যা প্রাপ্ত হন (৮)। এই সকল আলোচনা করিয়া এইটুকু বুঝিতেছি যে, আদিশূরের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক ভূশূরের পরাজয়ের ফলেই হৌক বা জ্ঞাতিবিরোধের কারণেই হৌক, ছোটখাট একটা বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। অনুমান হয়, সেই বিপ্লবের সময়ে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরদিগের ভিতরেও জ্ঞাতিবিরোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই, সেই সকল বংশধরদিগের মধ্যে যিনি যে দেশে সুবিধা মনে করিয়াছিলেন, তিনি সেই দেশেই উপনিবেশ করিয়াছিলেন। সেই অবধি রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে একটা বিভেদরেখা ভালরূপ দাঁড়াইয়া গেল। ভট্টগ্রন্থে সম্ভবত বংশধরদিগের এই উপনিবেশকার্য্যটী তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চব্রাহ্মণের উপর দিয়াই উক্ত হইয়াছে।

৯৭। কোথা হইতে আসেন?

এখন দেখা যাক যে, ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ কোন্ দেশ হইতে—কান্যকুব্জ দেশের কোন অংশ হইতে আসিয়াছিলেন? কান্যকুব্জ যে কিরূপ সুসমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত রাজ্য ছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম গ্রন্থে আছে যে, "কোলাঞ্চ হইতে ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে মিলিত হইয়াছিলেন" (৯)। হরিমিশ্রও ঐ কথা সমর্থন করেন (১০)। কারিকা পড়িলে মনে হয়, কান্যকুব্জের কোন এক অংশ সাধারণত কোলাঞ্চ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এবং সেই অংশের প্রধান গ্রামের নাম ছিল সম্ভবত কোলাঞ্চ। সেই কোলাঞ্চ ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ব্রাহ্মণেরা পিতৃপিতামহক্রমে

(৩) ব০ মো০ ৩২০পৃঃ।
(৪) ব০ মো০ ৩২১পৃঃ।
(৫) ব০ মো০ ৩২১পৃঃ।
(৬) ব০ মো০ ৩২২পৃঃ।
(৭) ব০ মো০ ৩২১পৃঃ—ঐতিহাসিক চিত্র ৮৫পৃঃ।

(৮) কান্যকুব্জাৎ স্থাপিতা যে হ্যাদিশূরেণ ভূভুজাঃ।
ত্রয়োবিংশতি পুত্রাঃ স্যুস্তেষাং বেদবিশারদাঃ ॥ ৮৭
* * *
তপোবিদ্যাগুণৈঃ সর্ব্বে পিতৃতুল্যা দ্বিজোত্তমাঃ।
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো হর্ষসংজ্ঞকঃ ॥ ৯০
বেদগর্ভো দ্বিজশ্চৈতে সহ ভূশূরভূভুজা।
পূর্ব্ববাসস্ত সন্ত্যজ্য রাঢ়দেশমুপাগতাঃ ॥ ৯৪
* * *
রাঢ়দেশে কৃতে বাসে তে দ্বিজাঃ পঞ্চসংখ্যকাঃ।
রাঢ়ীয়া ইতি বিখ্যাতা দেশনামানুসারতঃ ॥ ৯৬ কু, ত০

(৯) ব্রা০ কা০ ৮২পৃঃ। (১০) ব্রা০ কা০ ১০১পৃঃ।

বাস করিতেন। সর্ব্বানন্দমিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থেও ঐ কথাই উক্ত হইয়াছে (১১)। প্রেমবিলাস বলেন, ক্ষিতীশ (সুতরাং তাঁহার পুত্র ভট্টনারায়ণও বটে) কাহারও মতে জম্বুচট্ট গ্রাম হইতে এবং কাহারও মতে ডিল্লিচট্টর গ্রাম হইতে আসেন (১২)। বীতরাগ (সুতরাং তাঁহার পুত্র দক্ষও বটে) আসল কোলাঞ্চ গ্রাম হইতে আসেন। ইঁহাদিগকে সকলে কোলাঞ্চগ্রামবাসী বলিয়া জানে। সুধানিধি (সুতরাং তাঁহার পুত্র ছান্দড়ও বটে) তাড়িত বা তাড়ি দেশ হইতে, মেধাতিথি (সুতরাং তাঁহার পুত্র শ্রীহর্ষও বটে) ওড়ম্বর গ্রাম হইতে এবং সৌভরি (সুতরাং তাঁহার পুত্র বেদগর্ভও বটে) মত্রগ্রাম হইতে আসেন। কায়স্থকুলদীপিকাতে আছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণের অনুচরেরাও আপনাদিগকে "কোলাঞ্চ হইতে আগত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৩)। এদিকে ধ্রুবানন্দ মিশ্র বলেন যে, আদিশূরের দূত বৈজয়ন্তদেশ বা কাশীতে কান্যকুব্জরাজের নিকট পত্র লইয়া যায় (১৪)। এই সকল আলোচনা করিয়া অনুমান হয় যে, কান্যকুব্জরাজ্যের অন্তর্গত বৈজয়ন্ত বা কাশীদেশেরই এক অংশে কোলাঞ্চ প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম অবস্থিত ছিল। উপরোক্ত পঞ্চগ্রামই কোলাঞ্চ গণ্ডগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সাধারণতঃ কোলাঞ্চ নামেই চলিয়া যাইত বলিয়া অনুমান হয় (১৫)।

১৮। তাঁহাদের অনুচর কে?

পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন অনুচর তাঁহাদের দেহরক্ষীরূপে আসিয়াছিলেন (১৬)—ভট্টনারায়ণের সঙ্গে সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, শ্রীহর্ষের সহিত কাশ্যপগোত্রীয় বিরাট গুহ, দক্ষের সহিত গৌতমগোত্রীয় দশরথ বসু, ছান্দড়ের সহিত মৌদ্গল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত এবং বেদগর্ভের সহিত বিশ্বামিত্রগোত্রীয় কালিদাস মিত্র আসিয়াছিলেন (১৭)। কুলতত্ত্বার্ণব এই অনুচরগণকে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে জাত বলিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছেন দেখা যায় (১৮)। কেবল তাহাই নহে, উহাদিগকে "রাজন্যধর্ম্মী" বলা হইয়াছে (১৯)। প্রেমবিলাসে (২০) পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চ ভৃত্য আসিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে—ক্ষিতীশের সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ, বীতরাগের সঙ্গে দশরথ বসু, সুধানিধির সঙ্গে পুরুষোত্তম দত্ত, মেধাতিথির সঙ্গে বিরাট গুহ এবং সৌভরির সঙ্গে কালিদাস মিত্র। কায়স্থকুলদীপিকায় আছে যে, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ যথাক্রমে পূর্ব্বোক্তমত দাস বা পরিচারক সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। সারাবলী গ্রন্থে মুলো পঞ্চাননধৃত কুলার্ণববচনে আছে যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতিরই সঙ্গে উপরোক্ত দাস বা পরিচারকগণ আসিয়াছিলেন। কায়স্থকুলদীপিকাতেও সঙ্গীগণ আপনাদিগকে পরিচারকরূপে অভিহিত করিয়াছেন দেখা যায় (২১)। আমরা এগুলি দেখাইলাম এই জন্য যে, কুলতত্ত্বার্ণবের উক্তি অনুযায়ী পঞ্চব্রাহ্মণের পঞ্চ সঙ্গীকে সঙ্কর জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। একটী বিশেষ কথা এই দেখি যে, কুলগ্রন্থের মধ্যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি আসেন বা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি আসেন, তাঁহারা কখন্ আসেন, এসকল বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও কোন্ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে কোন্ গোত্রীয় কে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে এতটুকু মতভেদ দেখা যায় না।

১৯। কোন্ বেশে আসেন?

বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুলরামে বলেন যে, পঞ্চব্রাহ্মণ বর্ম্মপরিহিত দেহে অসি, বাণ, তূণীর, কোদণ্ড ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে আসিয়াছিলেন (২৩)। পার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁহার

(১১) কু০ ত০ ৫৪ শ্লোক, ব্রা০ কা০ ১০২পৃঃ।
(১২) প্রে০ বি০ ২৬২ পৃঃ।
(১৩) কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাং।
কা০ কু০—স০ নি০ ১১৩পৃঃ।
(১৪) পত্র লয়ে দূত যায় বৈজয়ন্ত (কাশী) দেশ।
ধ্রুবানন্দ—স০ নি০ ৩৩০।
(১৫) আযাতা বিপ্রবর্য্যাঃ শুচিতরহৃদয় পঞ্চকোলাঞ্চদেশাৎ।
বাচস্পতি মিশ্র—ব্রা০ কা০ ১০৫পৃঃ।
(১৬) কু০ ত০ ৫৩ শ্লোক।

(১৭) কায়স্থকুলদীপিকা—স০ নি০ ১৯।
(১৮) কু০ ত০ ৫০শ্লোক। (১৯) কু০ ত০ ৮৩ শ্লোক।
(২০) প্রে০ বি০ ২৪ম বিলাস, ২৬২পৃঃ।
(২১) ক্ষিতীশস্তিথিমেধশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ। ১
সৌভরিশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা পঞ্চদাসৈঃ সুরক্ষিতাঃ।
সারাবলী—স০ নি০ ৫০৭।
(২২) কা০ কু০—স০ নি০ ১১৩পৃঃ।
(২৩) আরুহ্য পঞ্চতুরগান্ অসিবাণতূণকোদণ্ডরম্যকবচাদিশরীরবেশাঃ। কু০ রা০—ব্রা০ কা০ ৮১-৮২পৃঃ।

আদিশূর ও বল্লালসেন গ্রন্থে বলেন যে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, "ব্রাহ্মণপঞ্চক বর্ম্ম, চর্ম্ম ও ধনু-র্বাণধারী যোদ্ধৃবেশে ভূষিত হইয়া অশ্বারোহণে রাজদ্বারে উপস্থিত হন" (২৪)। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতং গ্রন্থে আছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণ পরদিন চর্ম্ম-পাদুকা ধারণ করিয়া সূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত দেহে চর্বিত তাম্বূলরসে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন (২৫)। বাচস্পতি মিশ্রের কুলরামোক্ত উক্তি কুলতত্ত্বার্ণব সম্পূর্ণই সমর্থন করিয়াছেন (২৬)। প্রেমবিলাস বলেন যে, যোদ্ধৃবেশে পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন (২৭)। এই সকল আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, সে সময়ে প্রত্যেক রাজ্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে যাইবার পথঘাট নিতান্ত নিরাপদ ছিল না।

এমিয়েলের জার্নাল।

(শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়-কৃত অনুবাদ)

নারী প্রেম চায় ; এবং চায়, প্রেম যেন অহে-তুকী হয়—যেন রূপ-লাবণ্য, মধুর প্রকৃতি, ভদ্র-বংশ, প্রখরা প্রজ্ঞা এসকলের কোন এক-টিকেও প্রেম অবলম্বন না করে ; যেন আপনাদের সম্পূর্ণ নারীসত্তাই প্রেমের মূলে. কারণরূপে বর্ত্ত-মান থাকে। তাহারা মনে করে, বিশ্লেষণ মাত্রে বই অর্থ তাহাদের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ক পরিমাণ-দণ্ডের অধীন করিয়া তাহাদের মাহাত্মকে খর্ব্ব করিয়া দেওয়া। ইহা তাহারা কোন মতেই চায় না। ইহাদের অন্তরের এই যে প্রেরণা ইহা অভ্রান্ত। বিচারশক্তি দ্বারা হৃদয়বৃত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিলেই আমরা উহা হইতে পৃথক হইয়া পড়ি। যদি হৃদয়বৃত্তির উত্তেজনা সহ্য করাই নারীজীব-নের বিশেষত্ব হয়, তাহা হইলে প্রেম অনন্তকালই চিরসম্মোহনের বস্তু হইয়াই থাকুক—তাহাকে বিচার করিবার প্রয়োজন কি? রহস্য দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমের মোহিনী শক্তি বিলুপ্ত হয়। প্রেমের যে মাধুর্য্য তাহার প্রধান সম্বল ইহার অসীমতা, ইহার অলৌকিকতা, ইহার অনির্দ্দেশ্যত—সেই মাধুর্য্য সংরক্ষণার্থ আমাদের নিকট প্রেম চিরকালই দুজ্ঞেয় এবং বিশ্লেষণের অতীত হইয়া রহিবে। অধিকাংশ মানবই বোধগম্য পদার্থের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং অনধিগম্য বিষয়ের সম্মুখে নতশির হইয়া রহে। পুরুষের অলীক জ্ঞান গর্ব্বকে নিতান্তই অজ্ঞানসমাচ্ছন্ন বলিয়া তিরস্কৃত করিবার শক্তিধারণ নারীর প্রেমের শ্রেষ্ঠতম বিজয়গৌরব। তাই নারী যখন হৃদয়া-ন্তরে প্রেমের উদ্রেক করে তখনই সে বিশেষ-ভাবে দৃপ্ত বিজয়ের উল্লাস সম্ভোগ করে। আমি স্বীকার করি, নারীর উল্লাসের প্রকৃত ভিত্তি আছে, তথাপি আমার নিকট প্রতিভাত হয় যে প্রকৃত প্রেম শান্তি ও আলোকের আধার, ধর্ম্ম ও বিকাশের হেতু—তাহার মধ্যে অহঙ্কার প্রভৃতি হীনবৃত্তির স্থান নাই। মহদন্তঃকরণ মহত্বের জন্যই লালায়িত। অনন্তের দৃষ্টির উপর ভাসমান আত্মার নিকট সর্ব্বপ্রকার হীন চাতুরী ঘৃণ্য চপলতা মাত্র।

জিনেভা—১৭ই মার্চ্চ, ১৮৬৮।

অম্বুবাচী।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

'অম্বুবাচী' বলিতে সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, এই সময় তিন দিন ধরিয়া পৃথিবী অশুচি থাকে। এই কারণে অধ্যয়ন ও বীজবপন নিষিদ্ধ এবং সর্পভয় নিবারণ জন্য দুগ্ধপান বিহিত। কৃত্যতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে, "অত্রাধ্যয়নং বীজবপনং ন কার্য্যং। সর্পভয়োপশমনায় দুগ্ধং পেয়ং।"

অম্বুবাচী—প্রাবৃটের (monsoonএর) সূচক। কৃষি-প্রাণ ও কৃষিপ্রধান ভারতে প্রাবৃটের প্রতীক্ষাগণনা মরণ-বাঁচন কাঠি। মিটিরিয়োলজিকেল বিভাগের সমূহ আয়োজন এই উদ্দেশে প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর পুরাকালে রুদ্রযামল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন :—

"প্রাবৃট্‌কালে সমায়াতে রৌদ্র-ঋক্ষগতে রবৌ।
নাড়ীবেধ সমাযোগে জলযোগং বদাম্যহম্॥"

"সূর্য্য, আর্দ্রানক্ষত্রে গমন করিলে বর্ষা উপস্থিত হইবে। সেই সময়ে নাড়ীবেধ হইলে আমি তোমাকে জলযোগ অর্থাৎ বর্ষাকালের যোগ বলিব।"

(২৪) ব্রা০ কা০ ১০৫—১০৬পৃঃ।
(২৫) ক্ষি০ ব০ ২পৃঃ।
(২৬) কু০ ত০ ৫৪শ্লোক।
(২৭) প্রে০ বি০ ২৬২পৃঃ।

অম্বুবাচীর স্থিতিস্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শাস্ত্রকার বলিতেছেন—

যদার্দ্রর্ক্ষং সমাদায় ভানোর্ম্মন্মথগামিতা।
পুনস্তৎস্তেনমাদায় যজনং ত্রিদিনং ত্যজেৎ॥
কাম্যনৈমিত্তিকঞ্চৈব যাত্রাং মন্ত্রক্রিয়াস্তথা।
ঋতুমত্যাং ন কুর্ব্বীত পূর্ব্বং কল্পিতাদৃতে॥
ন কুর্য্যাৎ খননং ভূমেঃ সূচ্যগ্রেণাপি শঙ্করি।
বীজানাং বপনং চৈব চতুর্বিংশতিযামকং॥
প্রমাদাঃ বপনং কৃত্বা গাবস্তত্র প্রচারয়েৎ।
কৃচ্ছ্রং কুর্য্যাৎ তৎক্ষণাচ্চ খননাত্তিলকাঞ্চনং॥

ইতি মৎস্যসূক্তে মহাতন্ত্রে ৫৮ পটলঃ।

এইখানে একটু জ্যোতিষ বুঝা আবশ্যক। বারটি মাসে সর্ব্বশুদ্ধ বারটি রাশি আছে। এক একটি রাশিতে সূর্য্য এক এক মাস ব্যাপিয়া অবস্থান করেন; অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মেষরাশিতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষরাশিতে, আষাঢ়ে মিথুনরাশিতে, শ্রাবণে কর্কটরাশিতে ইত্যাদি। প্রতি মাসের যেমন এক একটি রাশি আছে, এবং প্রতি বৎসরের যেমন সর্ব্বশুদ্ধ বারটি রাশি আছে, তেমনি আবার প্রতি বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ২৭টি নক্ষত্র আছে। ইহাদের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু ইত্যাদি। এই ২৭কে ১২ দিয়া ভাগ করিলেই সওয়া দুই হয় এবং প্রতি মাসে উক্ত সওয়া দুই নক্ষত্রের ভোগ হয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বৈশাখ মাসে যথাক্রমে অশ্বিনী ১, ভরণী ১, ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের সিকি অংশ পড়ে; সূর্য্য তাহা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রের বাকী বার আনা অংশ, রোহিণী ১ ও মৃগশিরার অর্দ্ধ অংশ পড়ে, এবং আষাঢ়ে মৃগশিরার বাকী অর্দ্ধেক, আর্দ্রা সম্পূর্ণ ও পুনর্ব্বসুর বার আনা অংশ পড়ে। তাহা হইলেই বৈশাখ মাসের মধ্যে সওয়া দুইটি নক্ষত্র পড়ে। জ্যৈষ্ঠে ও আষাঢ়ে ক্রমান্বয়ে তাহাই। এইরূপে ১২ মাস সূর্য্য ২৭টি নক্ষত্র অতিক্রম করেন; আবার পর বৎসরে বৈশাখ মাসের প্রথমে অশ্বিনী নক্ষত্রের সঞ্চার হয়। একটি মাসের মধ্যে অর্থাৎ গড়ে ৩০ দিনের মধ্যে সওয়া দুই পরিমাণ নক্ষত্রের স্থিতিকাল হইলে প্রতি নক্ষত্রের স্থিতিকাল মাসের মধ্যে মোটামুটি ১৩ দিন হয়। অন্য কথায় বৈশাখ মাসে অশ্বিনী নক্ষত্র ১৩ দিন, ভরণী ১৩ দিন এবং কৃত্তিকা তিন দিনের কিছু বেশী অধিকার করিয়া থাকে। এইরূপে এক এক মাস পরিসমাপ্ত হয়। আষাঢ় মাসে "মন্মথগামিতা" অর্থাৎ মিথুন রাশিতে সূর্য্যের গমন হয়। প্রথম কয়েকদিন অর্থাৎ প্রায় ৬॥ দিন পরে মৃগশিরার অস্ত হয় এবং তাহার পরেই আর্দ্রা (আর্দ্রা+ঋক্ষ, নক্ষত্র) আর্দ্রর্ক্ষং নক্ষত্রের সঞ্চার হয়। ঐ সঞ্চার সময় হইতে অম্বুবাচীর সূচনা। (প্রায়) তিন দিন ও বিংশতি দণ্ড উহার স্থিতিকাল। এসম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুমে একস্থানে "তিন দিন" এবং অপর স্থানে "তিন দিন বিশ দণ্ড" আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে রবি আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করিলেই অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি হয়। এদেশের প্রচলিত বচনে আছে, "কিসের বার, কিসের তিথি সাতই আষাঢ় অম্বুবাচী। অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্র শেষ করিয়া রবি আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করিতে আষাঢ় মাসের ৭ই আসিয়া পৌছে। কোন কোন বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধ পরার্দ্ধ সংক্রমণাদি জন্য এই তারিখ এক দিনের তফাৎ হয়। যেমন বর্ত্তমান বৎসরের জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি দিবা পূর্ব্বার্দ্ধে হওয়ায় এক দিনের তফাৎ হইয়া অম্বুবাচী উপরোক্ত বচন অনুসারে ৭ই না হইয়া ৬ই হইয়াছে।

এখন অম্বুবাচীর স্থিতিকাল, আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদ অর্থাৎ সমস্ত মিথুনরাশির ৩ অংশ ২০ কলা বা আষাঢ় মাসের $\frac{1}{9}$ ভাগ। এই মিথুন রাশির ৩ অংশ ২০ কলা বা আষাঢ়ের $\frac{1}{9}$ ভাগ দিন হিসাবে (in term of days) ঠিক কয়দিন হইবে তাহা নির্ভর করে, আষাঢ়ের মোট দিন সংখ্যার উপর। এখন আষাঢ় কোনও বৎসর ৩১ দিনে, কোনও বৎসর ৩২ দিনে হয়। কাজেই দিন হিসাবে অম্বুবাচী স্থিতিকাল প্রতি বৎসরই যে ঠিক এক থাকিবে তাহা হইতে পারে না। আষাঢের সমস্ত দিনসংখ্যাকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে সেই ভাগফল অম্বুবাচী স্থিতিকাল হয়। আবার পূর্ব্বমাসের সংক্রান্তি সংক্রমণ হিসাবে অম্বুবাচী প্রবৃত্তির সময় (point of time) সরিয়া যায়। কাজেই প্রাতে অম্বুবাচী প্রবৃত্তি হইলে দিনগণনার স্থিতি যাহা হইবে, রাত্রে হইলে দিনগণনায় বেশী দেখাইবে। কাজেই "তিন দিন" বা "তিন দিন বিংশ দণ্ড" ইহা মোটামুটী বলা হইল দেখা যাইতেছে। যেমন আষাঢ় ৩১ বা ৩২ দিনে হইলে আষাঢ়ের $\frac{1}{9}$ ভাগ যথাক্রমে তিন দিন ২৬ দণ্ড ৪০ পল বা ৩ দিন ৩৩ দণ্ড ২০ পল হইবে।

এই সময়ে ভূমিসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যই কেহ করিবে না; এমন কি, বীজবপনাদি যদি কেহ করেন, তাহাও গরুর দ্বারা খাওয়াইয়া দিবেন—নিজে ঐ শস্য ব্যবহার করিবেন না—ইহাই শাস্ত্রের বিধান।

ঐ সময়ের বীজবপনের শস্য চণ্ডালপাক কেন ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। প্রাবৃটের পূর্ব্বে চাষকার্য্য সম্পূর্ণ না করিলে প্রথম বারিধারা বিফলে যাইতে পারে। আর প্রাবৃটের প্রারম্ভে শস্য বপন নানা কারণে অসঙ্গত। শস্যধ্বংশকারী কীটের প্রাদুর্ভাব ও প্রথম বারিপাতের প্রকোপে সেই সকল কীটের বাহিরে আসিবার কারণে বীজের হানি প্রভৃতি অনিষ্ট হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

আর্দ্রা নক্ষত্রের সঞ্চারে প্রাবৃটের আগমনসূচক অম্বুবাচীর আবির্ভাব কৃষিপ্রাণ ভারতের যে একটি বিশেষ স্বাভাবিক পর্ব্ব তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? বৈদিক সাহিত্যের ভিতরে অনেক স্থলে আছে যে পৃথিবী ক্ষেত্র, আকাশ হইতে উহাতে বৃষ্টিচ্ছলে বীজ পতন হয়, তাহারই ফলে ধরণী শস্যশালিনী হইয়া উঠেন। অম্বুবাচী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, "অম্বু বাচয়তি সূচয়তি" ইহা প্রথম বারিপাত সূচনা করে বা আনয়ন করে। অম্বুবাচীতে প্রতিবর্ষে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িবেই, ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। ক্বচিৎ ইহার বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। জ্যোতিষের গণনানুসারে আর্দ্রা নক্ষত্রে যোগ এদেশে বারি আনয়ন করিবেই করিবে। পৃথিবী এই আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ অপেক্ষা করে। ইহা হইতে রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী এসময়ে জলধারার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। পৌরাণিক-কাহিনীচ্ছলে বলা হইয়াছে যে, এই তিন দিন ধরিয়া পৃথিবীকে সামান্য পরিমাণেও খনন করিবে না, ইহাকে কোনরূপ আঘাত দিবে না, ফল শস্য রোপণ করিবে না বা পৃথিবীকে দগ্ধ করিবে না। পূর্ব্ব আরব্ধ কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না।

যতিনোব্রতিনশ্চৈব বিধবা যে দ্বিজাস্তথা।
অম্বুবাচী দিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ॥
স্বপাকং পরপাকং বা অম্বুবাচী দিনে তথা।
ভক্ষণং নৈব কর্ত্তব্যং চাণ্ডালান্নসমং স্মৃতং॥

ইতি সম্বৎসরপ্রদীপে বিষ্ণুরহস্যং।

অম্বুবাচী দিনে যতী ব্রতী বিধবা ও ব্রাহ্মণ নিজে বা পরের হস্তে পাক করিয়া আহার করিবে না। কারণ এ সময়ের পক্ব অন্ন চণ্ডালান্নের সমান হয় বলিয়া তাহাদের ধারণা। এইরূপে হিন্দুসমাজের ভিতরে একটি বিজ্ঞান-প্রসূত অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে এবং এইরূপ বিধি ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ভূমিকর্ষণ সম্বন্ধে নিষেধের অন্য কারণ থাকিতে পারে। আমাদের মনে হয়, অম্বুবাচীর পূর্ব্বেই জমি চষিয়া উহাকে বপনের বা রোপণের উপযুক্ত করিয়া রাখাই সেই কারণ। তাহা না হইলে কালবিলম্ব হেতু ও অম্বুবাচী সময়ে বৃষ্টির আধিক্য বশতঃ চাষের অসুবিধা ঘটিতে পারে। তাই কোন্ সময়ে হলকর্ষণের কার্য্য শেষ করিতে হইবে তাহারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে এবং উহাও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু বিধবারা এই তিন দিন পক্ব দ্রব্য আহার করেন না, পূর্ব্ব হইতে চিড়া ও ফল সংগ্রহ করিয়া রাখেন এবং এই তিন দিন ধরিয়া আহারের বৈচিত্র্যে তৃপ্তিবোধ করেন; তাঁহাদের আহার সম্বন্ধে একঘেঁয়ে ভাবও এই প্রকারে বিনষ্ট হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই অম্বুবাচীই এদেশের গণনায় 'মন্ সুন্' অর্থাৎ বারিপাতের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দেয়। এই অম্বুবাচীর কল্পনায় রূপকত্ব ও কবিত্বের বেশ সমাবেশ আছে।

শব্দ-ব্রহ্ম।

(শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য)

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ—এ সকল পূর্ব্বে কিছুই ছিল না—না ছিল চন্দ্রমা না, ছিল তপন—না ছিল আকাশ, না ছিল তারা—আজ যারা এতই উজ্জ্বল-এতই মধুর এতই স্নিগ্ধ—আজ যাদের প্রকাশে সকলই প্রকাশ—যাদের আলোকে সকলই আলোকিত—যাদের মাধুর্য্যে সকলই মধুর—আজ যাদের নয়নে ঘুম, হৃদয়ে স্বপন বচনে বেদ, কণ্ঠে গান, পরাণে প্রেম, জীবনে নাটক, তারা কিছুই ছিল না, কেহই ছিল না। আলোক ছিল না, আঁধার ছিল না—পূর্ব্ব ছিল না, পশ্চিম ছিল না, ঊর্দ্ধ ছিল না, অধো ছিল না, দেশ ছিল না, দিক ছিল না। এই মহাশূন্যে কে তুমি মহাপূর্ণ আপন আসনে সমাসীন ছিলে! এই মহা আঁধারে কে তুমি চির জ্যোতির্ম্ময় আপন আলোকে উদ্ভাসিত ছিলে? কে তুমি? কে তুমি? বল না কে তুমি, একবার বল না কে তুমি? অনন্ত শয়নে অনন্ত আসনে কে তুমি মহান্ অনাদ্যনন্ত! হঠাৎ আসন টলিল, অনন্ত কাঁপিল, তরঙ্গ ছুটিল, শব্দ উঠিল "তপঃ তপঃ"। ছিল না কিছুই, আসিল একটী—মহা অভিনয়ের উঠিল প্রথম দৃশ্য। টলিল সিন্ধু, ফুটিল কমল; ছিল নিরাকার, জাগিল তাহা হইতে সাকার। নিরাকারে একটী আকার মহাশূন্যে একটী শব্দ—শব্দে ছাইল বিশ্ব গগন। আজ আমি সৃষ্টির সহস্র সহস্র বৎসর পরে, এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যে শব্দ উচ্চারণ করিতেছি, —এই শব্দ—আমার এই কণ্ঠোচ্চারিত শব্দ সেই আদি শব্দ বা অনাদি শব্দ হইতেই নামিয়া আসিয়াছে—সেই অনাদ্যনন্ত প্রথম শব্দই আজ এই মর্ত্ত্যজীবের কণ্ঠোচ্চারিত ক্ষুদ্র শব্দের প্রাণভূত। ঐ দেখ ক্ষুদ্র মানবশিশু! শব্দরূপে পরমব্রহ্মের নাম তোমার কোমলকণ্ঠে কেমন সুন্দর সমুচ্চারিত হইতেছে। যাঁহাকে ধ্রুব খুঁজিয়াছেন, প্রহ্লাদ ডাকিয়াছেন, পৃথু পূজিয়াছেন —অর্জ্জুন সাধিয়াছেন, সেই সাধনের ধন, পূজনের দেব, ভজনের ভগবান—আরাধনের আরাধ্য—আজ তোমার আমার কণ্ঠে দিবারাত্রি অতি সরল ও সহজ ভাবে উচ্চারিত হইতেছেন। সাবধান মানব! এই শব্দের

অপব্যবহার করিও না—অপমান করিও না। যেখানে সেখানে যাহা তাহা বলিও না। এই শব্দ সরস্বতীর বীণায়, শিবের তানপুরায়, নারদের ত্রিতন্ত্রীতারে, যমুনাপুলিনে কৃষ্ণের বাঁশরীতে ধ্বনিত হইত। এই শব্দে হিমালয় জাগে, তপোবন কাঁপে, আকাশ হাসে। এই শব্দ বিহঙ্গের কণ্ঠে বনভূমির শ্যামলতায়, বনফুলের সুগন্ধ, বনলতার গ্রীবাভঙ্গে প্রকাশ পায়। এই শব্দ যখন শিশুর অধরে, তখন মাতৃহৃদয় টলে, মাতৃস্নেহ উছলে, মাতৃদুগ্ধ নির্ঝর-ধারায় ঝরে। এই শব্দ যখন পতিব্রতা সতীর কণ্ঠে, তখন মহাযোগী মহাদেব নাচেন, যুবরাজ রামচন্দ্র বনে বনে পাগলের ন্যায় ছুটেন, সাবিত্রীকোলে মৃত সত্যবান বাঁচেন, কণ্বের পবিত্র আশ্রমে রাজা দুষ্মন্ত আত্মবিক্রয় করেন। এই শব্দ যখন আচার্য্যের উপদেশে তখন সমগ্র মানবজাতি নতশিরে শোনে, সাধুর হৃদয়পদ্ম ফুটে, পাপীর চক্ষে জল পড়ে, আসক্তিবন্ধন টুটে, রাজা সিংহাসন ছাড়েন, রাজরাণী কৌপীন পরেন, রাজপুত্র আত্মবলিদানের জন্য শির অবনত করেন। এই শব্দই জনক যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠের কণ্ঠে, পাপীর বন্ধু খ্রীষ্টের প্রাণদানে, কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে গীতা রূপে প্রস্ফুটিত হয়; এই শব্দ কপিলাবস্তুর প্রাণসর্ব্বস্ব গৌতমের কর্ম্মবাণীতে দ্বারে দ্বারে নির্ব্বাণ এবং গৌরাঙ্গের প্রেমবাণীতে ঘরে ঘরে প্রেম বিলাইয়াছিল।

আজ যদি জগতে শব্দ না থাকিত, আজ যদি আকাশতলে অমৃতবীণা না বাজিত, আজ যদি শিশু "মা" "মা" না বলিত, বন্ধু প্রাণ খুলিয়া বন্ধুকে মর্ম্মব্যথা না শুনাইত, হৃদয়ের জ্বালায় বিরহী দেশ মাতাইয়া বিচ্ছেদের গান না গাহিত—যদি সব মানব মূক হইত, তবে কল্পনা কর, এই অতুলনীয় সুন্দর বিশ্বসৃষ্টির কতই না দুর্দ্দশা হইত? শব্দ না থাকিলে, মানবের কণ্ঠে ভাষা না ফুটিলে আজ মানব মানবই হইতে পারিত না। ক্ষুধা তৃষ্ণা আসিত কিন্তু ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল চাহিতে পারিত না—রোগের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিত, কিন্তু হায়! সহস্র চেষ্টাতেও রোগযাতনা চিকিৎসককে বুঝাইতে পারিত না, রোগের ঔষধ মিলিত না। হৃদয়ে প্রেমপদ্ম বিকশিত হইত কিন্তু প্রাণ খুলিয়া প্রেমাস্পদকে তাহা কোন মতেই জানাইতে পারিত না। জীবনটা বোবার স্বপ্নের ন্যায় কতই যাতনাময় হইত। সুতরাং ভাবিয়া দেখ শব্দ বা ভাষা আমাদের কি স্বর্গীয় বন্ধু! কথা! তুমি কি অনুপম—তোমার বাড়ী এদেশে নয়—তুমি স্বর্গপুরে ব্রহ্মকণ্ঠে ছিলে—আমাদিগকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আমাদের মর্ত্ত্যে আসিয়াছ। তোমাকে আমরা নরনারী মিলিয়া বরণ করি। শব্দ তোমাকে আমাকে রোগে শোকে পাপে তাপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। শব্দ তোমাকে আমাকে শয়নে স্বপনে বিশ্বস্রষ্টার মহান্ লক্ষ্যের দিকে অলক্ষিতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। শব্দ এই সৃষ্টিকে স্বর্গে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। শব্দরূপে অশব্দ ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সাড়া দিতেছেন—মৃতকে বাঁচাইয়া, ঘুমন্তকে জাগাইয়া, বধিরকে শুনাইয়া, অবিরত বলিতেছেন, "অহমস্মি" আমি আছি। এই "আমি আছি" রব কে না শুনিতে পায়? কাহার নিভৃত হৃদয়কুটীরে এই নিত্য নূতন বাণী না বাজে? এ জগতে কে এমন পাষাণ, এমন আত্মবোধরহিত, যে বিশ্বস্রষ্টার এই বজ্রগম্ভীর নিনাদ না শুনিতে চায়? তোমরা গগনমাঝে বিশ্ববিকম্পী বজ্র নিনাদে কি সেই মহান্ প্রভূতৈশ্বর্য্য পুরুষের গম্ভীর নিনাদ শুনিতে পাও না? তোমরা প্রলয়ঙ্করী মহা ঝঞ্ঝাশব্দে কি সেই জীবন্ত মহাশক্তির হুঙ্কারধ্বনি অনুভব কর না? তোমরা মহাসিন্ধুর বিশ্বগ্রাসী পর্ব্বতোপম ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে কি সেই ভবজলধিতারণের মহান রব কর্ণগোচর কর না? তেমনি কি তোমরা ভ্রমরগুঞ্জনে, বিহগকূজনে, সন্ধ্যাসমীরণে সেই মধুময় দেবতার প্রেমভরা আহ্বান-রব কি শুনিতে পাও না? যিনি বলিয়াছিলেন, "যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক" তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক—মহাশূন্যে আঁধার ঠেলিয়া আলোক চলিয়া অবিরত এক রব উঠিতেছে—'আমি আছি-আমি আছি-আমি আছি'! ভক্তযোগী এই রবের প্রত্যুত্তরে বলেন—'তুমি-আছ তুমি-আছ তুমি আছ'! কি রূপ জানি না, কি নাম জানি না, কি ভাব বুঝি না—এমন আশ্চর্য্য, এমন চমৎকার, এমন অদ্ভুতপূর্ব্ব আর কি আছে? "সর্ব্বে বেদা যৎ পদম্ আমনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্‌বদন্তি, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি"—সেই তুমি এই শব্দরূপে বাণীরূপে বিশ্বব্যাপী ওঁকার ধ্বনিতে বিশ্বকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ। তোমাকে নমস্কার! তোমাকে নমস্কার।

সৃষ্টির প্রথমেই শব্দ—অশব্দ হইতে শব্দ—শূন্য হইতে শব্দ ছুটিল—ছুটিতে ছুটিতে জলস্থল ভেদিয়া, তরুলতা দোলাইয়া, পশুপক্ষী জাগাইয়া, নরনারীর দ্বারে আসিয়া মিলিল! নরনারি! তোমাদের প্রাণে জ্ঞানে, জাগরণে, স্বপনে ব্রহ্মনাম মিশিয়া গেল। তোমাদের সুখে দুঃখে শোকে আনন্দে—চক্ষের জলে হাসির তরঙ্গে শব্দ-ব্রহ্ম মিশিয়া গেল। তোমাদের হিরণ্ময় কোষে নিষ্কল ব্রহ্ম শব্দের আকারে ভাষারূপে, সন্ধি সমাস অলঙ্কাররূপে, বৃহতী অনুষ্টুপ ছন্দে, গদ্যে পদ্যে, রাগরাগিণীতে উজ্জ্বল-রূপে প্রকাশ পাইলেন। কেবল বেদে নহে, বেদান্তে নহে, পুরাণে নহে, কোরাণ-বাইবেলে নহে—কিন্তু প্রতি কথার চক্ষের প্রত্যেক চাহনিতে, হৃদয়ের প্রত্যেক ভাবে—

মর্ম্মের প্রত্যেক তারে ব্রহ্ম ঝঙ্কার করিতেছেন। কখনও আদেশে, কখনও উপদেশে, কখনও স্নেহে, কখনও প্রেমে শব্দব্রহ্ম তোমাকে কত কথাই শুনাইতেছেন। এ বিশ্বে যত তান উঠিয়াছে, যত কথা ফুটিয়াছে, যত গান গাহিয়াছে, যত অর্চ্চনা বন্দনা হইয়াছে, যত পুস্তক লিখিত হইয়াছে সবই ব্রহ্মমুখ হইতে উৎসারিত! তাঁহার একটী মুখ নহে সহস্র মুখ—অনন্তদেব অনন্তমুখে অবিশ্রান্ত অনন্ত শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। কি মধুর, কি প্রাণপ্রদ!

শব্দের কি আশ্চর্য্য শক্তি। ইহা পর্ব্বত পাথার মানে না—দেশ কাল মানে না। শব্দ অজেয় অমর। হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে ধ্যানমগ্ন ঋষি নির্জ্জনে কি-শব্দ উচ্চারণ করিলেন—অভ্রভেদী পর্ব্বত ভেদিয়া দিগন্ত কাঁপাইয়া দেশ কাল ঠেলিয়া সেই শব্দ—"তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্" শব্দ আজ আমাদের তোমাদের পুস্তকে লিখিত, গৃহে গৃহে উচ্চারিত ও সভায় সভায় পঠিত হইতেছে! ঋষি নিজ অস্থি পাষাণগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ অচিন্ত্য দেশে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চারিত শব্দ হিমালয় ছাড়িল না—ভারতও ছাড়িল না—শুকাইল না—ম্লান হইল না—বরং দিনে দিনে অজেয় বিক্রমশালী হইয়া উঠিতেছে! ধ্রুব চলিয়া গেলেন—তাঁহার সেই নিবেদনধ্বনি "স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে" তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল না। প্রহ্লাদ বিদায় লইলেন—কিন্তু তাঁহার সেই প্রাণের কথা আমাদের নিকট হইতে আজিও বিদায় লইল না। মানব চলিয়া গেল—অভিনয় ফুরাইয়া গেল—শ্রোতারা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন—আলোকমালা নিবিল—রঙ্গালয় ধূলিতে মিশাইল—কিন্তু অভিনেতাদিগের কণ্ঠরব চলিয়া গেল না—শ্রোতাদের হৃদয় ছাড়িল না—আলোকের সঙ্গে নিবিয়া গেল না। তাহা মহাকাশে মিশিয়া অক্ষয় ও অমর হইল। তাই আমরা বাল্মীকির শান্ত তপোবনে জন্মদুঃখিনী সীতার করুণ ক্রন্দনধ্বনি আজিও শুনিতে পাই—তাই আমরা কুরুসভায় সতী লক্ষ্মী দ্রৌপদীর আকুল রোদনরব শুনিয়া আজিও দুরন্ত দুঃশাসনকে শাসন করিতে ছুটিয়া যাই। এই বিশ্বগগনে সমগ্র মানবমণ্ডলীর উচ্চারিত শব্দ চির দিনের মত ধৃত হইয়া রহিয়াছে। মানব যত ভাবিয়াছে—যত কাঁদিয়াছে—যত বেদনা জানাইয়াছে—যত প্রার্থনা করিয়াছে, যত আত্মপরিচয় দিয়াছে—সব ধরা আছে—সব বেঁচে আছে, সব জেগে আছে। শব্দ যদি ফুরাইত তবে মানবজাতি বাঁচিত কি লইয়া? রামায়ণ মহাভারত না থাকিলে কাঁদিয়া জুড়াইতাম কি? গীতার শব্দ কুরুক্ষেত্রের অস্ত্রঝন্‌ঝনায়, গাণ্ডীবটঙ্কারের ভীষণ শব্দসাগরে বিলীন হইলে আমরা বাঁচিতাম কিরূপে? যে বিশ্বের একটু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকাও মরে না—যে বিশ্বের একটী অণু-পরমাণুও উড়ে না—সে বিশ্ব তপোবনে নরনারীর কণ্ঠোচ্চারিত আনন্দ ও বিষাদ গাথা কি ফুরাইতে পারে?

মানবের কণ্ঠস্বর বিশ্বেশ্বর নিরন্তর আদর করিয়া শুনিতেছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমতাল রাখিয়া সেই জগদেকচন্দ্রের যশোগান করিতেছে। সভ্য অসভ্য, আর্য্য অনার্য্য, রক্তবর্ণ শ্বেতবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ মানবসন্তানগণ কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ মহাদেব, কেহ কৃষ্ণ, কেহ যীশু, কেহ চৈতন্য সাজিয়া এই মহা উপাসনামন্দিরে সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন ইংরাজী, ফরাসী, উর্দ্দু পারসী প্রভৃতি কত ভাষায় সেই অবাঙ্মনসগোচরের স্তুতি গান করিতেছেন, নারদের ত্রিতন্ত্রী ঝঙ্কারে দায়ুদের বীণায় গঙ্গা যমুনার ন্যায় সঙ্গত হইতেছে; শিবের স্তবে যোশেফের প্রার্থনা মিশিয়া যাইতেছে—সব শব্দ এক শব্দেরই প্রতিধ্বনি—সমস্ত বিশ্বমানবের প্রাণ হইতে একই শব্দ ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং—জ্বলন্ত অক্ষরে গগনে গগনে লিখিত হইতেছে। বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস—দেশ কাল না মানিয়া এক হইয়া যাইতেছেন। যে সব প্রিয়তম মানবসন্তান বিধির বিধানে ইহলোক হইতে পরলোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, সেই সব মানবের উদ্দেশে, সেই সব পিতা মাতা স্বামী সখা ও পুত্র-কন্যাগণের প্রতি কতই না আকুল আহ্বান ধ্বনি, কতই না মর্ম্মগাথা, কতই না প্রাণের কথা, ইহলোক হইতে পরলোকের দিকে, জ্ঞাত হইতে অপরিজ্ঞাতের অভিমুখে, সান্ত হইতে অনন্তের পথে নিরন্তর ছুটিতেছে। মহাকালসিন্ধুর এপার হইতে ওপারে ওপার হইতে এপারে কত শব্দ, কত ধ্বনি কত রব নিরন্তর শ্রুত হইতেছে। যাহার কর্ণ আছে সে আজ শুনুক সহস্র সংবৎসরের যবনিকা ভেদ করিয়া ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের মহা ঋষির কলকণ্ঠোচ্চারিত বেদসঙ্গীত আমাদের কর্ণে কর্ণে ঝঙ্কার করিয়া বলিতেছে "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। যিনি এই বিশ্ব-শব্দের প্রবর্ত্তক, তিনি শুনিতে ভাল বাসেন বলিয়াই আরাধকের উচ্চারিত সমগ্র মন্ত্রমালা অক্ষয় অব্যয় হইয়া সেই জগদারাধ্যের মহাসিংহাসনতলে নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের সারস্বত সম্মিলনের এক অধিবেশনে স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ তাহা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেবের ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। গুরুদাস বাবুর ন্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের বহু কৃতবিদ্য ছাত্রই উক্ত মনীষীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ই. বি. কাউয়েল সেকালে সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেরই নিকট 'ঘরোয়া' নাম ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম-এ উপাধিধারী নীলাম্বর বাবু, খ্যাতনামা আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বাঙালীর মুখোজ্জ্বলকারী বহু মহানুভব পুরুষই তাঁহাদের জীবন গঠনের জন্য উক্ত মনীষীর নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষগণের চিত্রাবলী মধ্যে মহানুভব বিদ্যাসাগরের চিত্রের পরই কাউয়েল মহোদয়ের চিত্র বর্ত্তমান। জাতিতে ইংরাজ হইলেও প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহাকে ভারতীয় ঋষিশ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। বিজাতীয় পরিচ্ছদের ভিতর দিয়াও ভারতীয় জনসুলভ একটী উচ্চ ভাব বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। শোনা যায়, ভট্ট মোক্ষমুলার কল্পনানেত্রে ভারতজননীর মুনিগণঅধ্যুষিত যে মহতী মুর্ত্তিটীর অনুধ্যান করিতেন, পাছে তাঁহার সে স্বপ্নের মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, তাই তিনি কখনও ভারতে পদার্পণ করেন নাই। মহামতি কাউয়েল উক্ত মহাত্মারই প্রেরণানুপ্রাণিত মানসপুত্র—বাস্তবলোকে ভারতীয় গৌরবময় বৈদিক যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী মহাপুরুষ। যে সমস্ত মহাপুরুষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্তম্ভকে সুদৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন কাউয়েল সাহেব তাঁহাদেরই একজন ছিলেন।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী ইংলণ্ডের সাফোক বিভাগের অন্তর্গত ইপস্‌উইচ্ গ্রামের সেন্টক্লেমেন্ট ষ্ট্রীটের গৃহে কাউয়েল সাহেবের জন্ম হয়। সুদৃশ্য পল্লীটির ঐ অংশে তৎকালে বহু ব্যবসায়ী পরিবার বাস করিতেন। কাউয়েলের পিতামহ আব্রাহাম কেরেসি কাউয়েল ইপস্‌উইকের পুরাতন পাঠশালার একটী ছাত্র। তিনি ধার্ম্মিক, কর্ম্মঠ ও পরোপকারী ছিলেন এবং অধ্যবসায়গুণে উক্ত পল্লীতে একটী বর্দ্ধনশীল ব্যবসায়ের পত্তন করেন। তাঁহার বৃহৎ পরিবারে অনেক পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চার্লস্ জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তিনি তাঁহার পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইপস্‌উইক পল্লীর অপর একটী উন্নতিশীল ব্যবসায়ী পরিবারের কর্ত্তা "হিল হাউস্" নামক ভবনবাসী ন্যাথানিয়েল বাইল্‌স্ বাইল্‌সের জ্যেষ্ঠা কন্যা ম্যারিয়াণার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল উঁহাদেরই জ্যেষ্ঠপুত্র।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইপস্‌উইকের প্রাচীন গ্রামার স্কুলে কাউয়েল সাহেবের বিদ্যারম্ভ হয়। ঐ পুরাতন পাঠশালাটী এক সময়ে রাণী এলিজাবেথের পাঠশালা বলিয়া কথিত হইত এবং রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের সময়েও যে উহার অস্তিত্ব ছিল সে বিষয়েও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে কাউয়েল ইটন ল্যাটীন গ্রামার নামক পুস্তককে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন। প্রধানশিক্ষক রেভাঃ জে, সি, ইবডেন উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন, তাঁহার বিদ্যাবত্তাও কম ছিল না। তিনিই বাল্যবয়সে কাউয়েলের মনে কর্ম্মপ্রবণতা ও উদ্যমপ্রিয়তা জন্মাইয়া দেন। ইবডেনের ছাত্র বলিয়া কাউয়েল ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ গৌরবানুভব করিতেন। প্রথম হইতেই কাউয়েল পরিশ্রমী ছাত্র বলিয়া গণ্য হন এবং সুশিক্ষা লাভ করিবার কৌশলটী অবগত হইতে পারেন। উজ্জ্বল স্মৃতিশক্তি ও বিদ্যানুরক্তিবশে তিনি অল্প সময়েই একটী ছাত্রবৃত্তি লাভে সমর্থ হন। পাঠস্পৃহা বলবতী হইলেও তিনি তৎকালীন বাল্যক্রীড়াগুলিকে অনাদর করেন নাই। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার অসীম বিদ্যানুরাগ

প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এইজন্য এই বিদ্যালয়ে নয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিলেও তাঁহার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হয় নাই। ভবিষ্যতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি আপনার আকাঙ্ক্ষা অনেকটা নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

বাল্যকালে যে কয়েকজনের প্রভাব কাউয়েলের চরিত্রগঠনের সহায়তা করিয়াছিল এবং তাঁহার চিত্তে সাহিত্যপ্রবণতা ও উচ্চ আশা আনিয়া দিয়াছিল তন্মধ্যে তাঁহার মাতাপিতাই প্রধান। কাউয়েলের পিতা একজন চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আধুনিক ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র পড়িতে ভাল বাসিতেন এবং সামাজিকতা ও সাধারণ সভা সমিতিতে বক্তৃতা প্রদান বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। কাউয়েল নিজ জীবন গঠনের জন্য তাঁহার মাতার নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। মাতা ও পুত্রের মধ্যে একটী যথার্থ প্রেম বিদ্যমান ছিল। তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে পঠিত বিষয়ের সার সঙ্কলন অভ্যাসটী আয়ত্ত করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মাতা অধ্যয়ন বিষয়ে যত্নশীল ছিলেন, বিশেষতঃ কবিতাপুস্তক তাঁহার নিকট একটী আকর্ষণের বস্তু ছিল। কাউয়েলের মাতৃস্বসা এলা তাঁহাকে অশ্বারোহণ-বিদ্যায় পটু করিয়া তুলিয়াছিলেন—ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে তিনি ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। এলা ফরাসী সাহিত্যে অনুরাগিণী ছিলেন, তিনি কাউয়েলকে তাঁহার সহিত ফরাসী ইতিহাস ও কবিতাগ্রন্থ সমূহ পড়িতে উৎসাহিত করিতেন। মাতুল বার্ণাড বাইলস্‌ও কাউয়েলের জীবনে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি নীতিশাস্ত্রানুরাগী ছিলেন এবং এতদ্বিষয়ে অনেক পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। ভবিষ্যতে তিনি বিচারকের আসনও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত দিবাভাগ কার্য্যালয়ে অতিবাহিত হইত, এই জন্য তিনি অরুণোদয়ের বহু পূর্ব্বে উঠিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তাঁহার এই অভ্যাসটী কাউয়েলের জীবনে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। কাউয়েল তাঁহাকেই অনেক সময় তাঁহার প্রাথমিক অধ্যয়ন বিষয়ে অগ্রগামী সহায়ক ও উৎসাহদাতা বলিয়া বর্ণনা করিতেন।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাউয়েলের অধ্যয়নস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে বয়সে মানুষ খেলাধূলাকেই প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করে, সেই অল্প বয়সেই তিনি আপনার জ্ঞানের খাদ্য যোগাইবার জন্য জলপানের পয়সাগুলি যত্নপূর্ব্বক সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং অবসরমত নানা নূতন পুস্তক কিনিয়া পাঠস্পৃহা চরিতার্থ করিতেন। এইরূপে বাল্যবয়সেই তিনি Walker's Corpus Poetorum Latinorum নামক সুবৃহৎ পুস্তকটী ক্রয় করিয়া ফেলেন। উক্ত পুস্তকটী এক্ষণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তকশ্রেণীমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সময় পুস্তকবিক্রেতার দোকানের আলমারিতে সজ্জীভূত Livy নামক সুবৃহৎ পুস্তকের কোন সংস্করণের খণ্ডগুলি তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কাউয়েলের এক ভ্রাতা কেবল স্কুলপাঠ্য পুস্তকই ক্রয় করিতেন, তিনি উক্ত বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে classic কিনিবার উপদেশ দিতেন।

ইপস্‌উইক্ গ্রামে একটী সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল। বহু অমূল্য পুরাতন পুস্তকাবলীতে উক্ত গ্রন্থাগারটী পূর্ণ থাকিত। কাউয়েল আপনার বিশ্রামসময়ের অধিকাংশই উহাতে যাপন করিতেন। এখানে তিনি সার উইলিয়াম জোন্সের গ্রন্থাবলী দেখিতে পান। ঐ গ্রন্থাবলী মধ্যস্থিত আরবী ও পারসী কবিতাবিষয়ক ল্যাটীন পুস্তকটীই প্রথমে তাঁহার মনে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য দেশের প্রতি একটা যথার্থ আকর্ষণ আনিয়া দেয়, বিশেষতঃ Commentarii নামক পুস্তকটী ও 'শকুন্তলা'নামক পারসী কবিতার একটী অনুবাদ তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি ঐ পুস্তক দুইটী নিজগৃহে লইয়া গিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। উক্ত পুস্তক দুইটী যত্নসহকারে পাঠ করিবার পর তিনি সাহিত্যসভার সম্পাদক মিঃ লেভেটের সাহায্যে সার উইলিয়ম জোন্সের গ্রন্থাবলী মধ্যস্থিত পারসী ব্যাকরণটী খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হন। অল্প সময়ের মধ্যেই অক্ষরগুলি আয়ত্ত করিয়া তিনি অভিধানের সাহায্যে উক্ত ব্যাকরণে প্রযুক্ত সুন্দর সুন্দর উদাহরণগুলি পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের

এডিনবরা রিভিউ নামক পত্রিকায় লর্ড মেকলের ওয়ারেণ হেষ্টিংস বিষয়ক প্রসিদ্ধ রচনা প্রকাশিত হয়। কাউয়েল যত্নসহকারে উহা পাঠ করেন। কিন্তু এই সূত্রে ইহাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ঐ সংখ্যায় মুদ্রিত নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলীর বিজ্ঞাপন মধ্যে তিনি হোরেস্ হেমেন উইলসন্ প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের নাম দেখিতে পান। বড়দিনের পার্ব্বণীর পয়সাগুলি জমাইয়া অচিরকাল মধ্যে তিনি উহার একখণ্ড ক্রয় করেন। প্রথমতঃ সংস্কৃতভাষা অত্যন্ত কঠিন বোধ হওয়ায় তিনি ভবিষ্যতের আশায় উহা রাখিয়া দেন এবং পারসী শাহনামা ও হাফিজ পড়িতে থাকেন। তৎকালীন ইপস্‌উইকবাসী বোম্বাইয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল হকলে তাঁহাকে এই বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তাঁহারা উভয়ে জুলেখা ও ইউসাফ পাঠ করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে কাউয়েলের পিতৃ-বিয়োগ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া পিতার ব্যবসায়ে প্রবেশ তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। বিবেকানুরুদ্ধ হইয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন এবং একজন বিশ্বস্ত কেরাণীর সাহায্যে অল্পকালেই সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লইতে সমর্থ হন। তাঁহার ভ্রাতা উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সাত বৎসর ধরিয়া তিনি সুচারুরূপে ব্যবসায় কার্য্যটী নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ক্ষেত্রে কর্ম্মবহুল দিন-গুলি যাপন করিবার সময়েও তিনি গ্রীক্, ল্যাটীন, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান্ ও পারসী সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। ইংরাজী উপন্যাস ও কবিতাপুস্তকসমূহও বাদ যাইত না। ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে প্রায়ই লণ্ডন নগরীতে যাইতে হইত, সেখানে তাঁহার সহিত অধ্যাপক উইলসনের পরিচয় হয়। মহাত্মা উইলসন্ অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক এবং ইণ্ডিয়াহাউস্‌গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রণেতা ও প্রথম সংস্কৃত ইংরাজী কোষকার ছিলেন *। ইংলণ্ডে তখন তাঁহার ন্যায় সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত কেহই ছিলেন না *। কাউয়েল ইঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন, কিন্তু নিয়মিত ভাবে শিক্ষাগ্রহণ করিতে না পারায় মেজর হকলের সহিত পারসী ভাষাটিই উত্তমরূপে পড়িতে থাকেন। এরূপ আগ্রহ ও যত্নের সহিত কাউয়েল অধ্যয়ন করিতেন যে অতি সুকঠিন পুস্তকও তাঁহার নিকট পরম আনন্দদায়ক বলিয়া মনে হইত। এই সময়কার তাঁহার কোন বন্ধুর প্রতি লিখিত একটী পত্রে জানা যায় যে, গ্রীক্ ঐতিহাসিক থুসিডাইডের সুকঠিন পুস্তক-গুলিও তাঁহার নিকট উপন্যাসের ন্যায় মধুর লাগিত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা তাদৃশ অগ্রসর হয় নাই। যাহা হউক তাঁহার বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম তাঁহাকে প্রায়ই ইণ্ডিয়া হাউসে উইল্‌সনের নিকট লইয়া যাইত। ইহাতে তিনি উপকৃত হইতেন বলিয়াই মনে হয়।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কাউয়েল প্রথম তাঁহার মাতৃ-স্বসা ও মাতুলের সহিত ইংলণ্ডের বাহিরে ভ্রমণ করিতে যান। ইহা তাঁহাদের সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিকর হইয়াছিল। এই বৎসরই একসময় তিনি তাঁহার দুইটী বন্ধুর সহিত নিকটবর্ত্তী সুদৃশ্য ব্র্যামফোর্ড গ্রামে বেড়াইতে যান। সেখানে গিপিং নদীর উপরিস্থ একটী সেতুর উপর তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ পত্নীকে দেখিতে পান। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে

---

* অবশ্য বঙ্গদেশবাসী পণ্ডিতগণের সাহায্যে (পণ্ডিত গিরীশ-চন্দ্র বিদ্যারত্নকৃত শব্দসার অভিধানের ১ম সংস্করণের বিজ্ঞাপন দেখুন) তিনি উক্ত অভিধানটী প্রণয়ন করেন।

* East India Comanyর অস্ত্রচিকিৎসকরূপে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। Lord Amherstএর শাসন সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ডেভিড্ হেয়ার ও সুপণ্ডিত ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সহকারিতায় ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গোড়াপত্তন করেন (পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগরকৃত চাণক্য-শ্লোকের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য), লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক যখন এদেশে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হন, তখন ইনিই সংস্কৃতের বার স্বপক্ষে মত দেন। সংস্কৃত কলেজের অত্যুজ্জ্বলরত্ন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় ইঁহারই যত্নে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পাঠার্থীরূপে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন এবং ইনিই ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পণ্ডিতমহাশয়কে অলঙ্কারাধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন "তর্কবাগীশ মহাশয় রাঢ়দেশবাসী, সুতরাং গঙ্গাতীরবাসী সদ্‌ব্রাহ্মণগণ ইঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিবেন না" বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করায় ইনি বলিয়াছিলেন যে, "আমি প্রেমচন্দ্রকে কন্যাদান করিতেছি না, তাঁহার গুণের পুরস্কার করিয়াছি; ঈর্ষাকুল কয়েকজন অধ্যয়ন না করিলে বিদ্যালয়ের কোনও ক্ষতি হইবে না।" (রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় লিখিত তর্কবাগীশজীবনী ২৮পৃষ্ঠা) ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কিছুকাল ইনি সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকও হইয়াছিলেন। কোনও এক সময়ে সংস্কৃত কলেজ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইলে ইনি বিলাতে চেষ্টা করিয়া উহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সেই সময় তর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতির সহিত ইঁহার শ্লোকে পত্রব্যবহার হইয়াছিল। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিভবনের যে কক্ষে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির চিত্র বর্ত্তমান তাহার পশ্চাতের কক্ষে ইঁহার একটী ক্ষুদ্র চিত্র আছে।

তাঁহার বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইয়া যায়। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হন এবং ভবিষ্যৎপত্নী এলিজাবেথকেও তাঁহার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন। এলিজাবেথ গ্রীক্ ও ল্যাটীন ভাষা এবং অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর লণ্ডন ব্রেডষ্ট্রীটের মিলড্রেড্ গির্জ্জায় বিনা আড়ম্বরে তাঁহাদের বিবাহকার্য্য সমাধা হয়।

এই বৎসরই শীতকালে তিনি তাঁহার পত্নীর পিত্রালয় ব্রামফোর্ড গ্রামকেই তাঁহাদের বাসস্থানরূপে মনোনীত করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ বাড়ীতেই বাস করিযাছিলেন। ব্রামফোর্ড ভবনে তিনি সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালযে শিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি শীঘ্রই অক্সফোর্ড যাইতে মনস্থ করেন।

তাঁহার পত্নী চতুরা এবং বাল্যকাল হইতেই পরিণত-বুদ্ধিশালিনী রমণী ছিলেন। স্ত্রীজাতির বিশিষ্টতা ও ব্যক্তিত্ব তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এই সর্ব্বগুণসম্পন্না পত্নীর সহায়তা লাভ করিয়াই কাউয়েল জীবনে বহু বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবংবিধ পত্নীদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর অক্সফোর্ডে গমন করেন এবং পরদিনই সেথানকার বিদ্যাপীঠে প্রবেশানুমতি লাভ করেন। সত্বর আপনার দৈনিক কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিয়া তিনি প্রাণপণ পরিশ্রমে অধ্যযন করিতে আরম্ভ করিলেও প্রাচ্যদেশীয ভাষাসমূহ কথনও তাঁহার নিকট অনাদর প্রাপ্ত হয় নাই। প্রায়ই তিনি অধ্যাপক উইল্‌সনের বক্তৃতায় যোগদান করিতেন। মহাত্মা উইল্‌সন একদিন তাঁহাকে ফ্রেড্‌রিক ম্যাক্স মূলরের * বক্তৃতা শুনিতে লইয়া যান। নিয়মিত ভাবে উইল্‌সনের বক্তৃতায় যোগদান করা ব্যতীত সপ্তাহে একদিন করিয়া তিনি তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে ইংলণ্ডে যে পরিমাণ সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারা যাইত যতদিন না তিনি সেই পরিমাণ শিক্ষা পূর্ণমাত্রায় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ততদিন তিনি উল্লিখিত ভাবে নিয়মিত কার্য্য করিতে থাকেন। ভবিষ্যতে ভারতীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে তাঁহার উক্তবিষয়ক জ্ঞানলাভের পূর্ণতা ঘটিয়াছিল এবং প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ. ডি কৃত অনুবাদ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেশ্বর সাংখ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

পতঞ্জলির যোগসূত্র এইবার দেখা যাউক। যোগসূত্রকে সকলেই সাংখ্যদর্শনের একটী অতি প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন এবং ইহাকে একটী সাংখ্যদর্শনই বলা হইয়া থাকে। (মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩০৫, ৩০৭ অধ্যাযে বশিষ্ঠ ঋষি এবং ৩১৬ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যাহা বলিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং একথা বলা অনাবশ্যক যে সাংখ্যদর্শন ঠিক ভাবে বুঝিতে গেলে যোগদর্শনের সম্পূর্ণ জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যটী কেবল যে যোগসূত্র বুঝিবার জন্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় তাহা নহে, সমগ্র সাংখ্যদর্শন বুঝিতে গেলেও ইহা আবশ্যক; এবং কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে যোগসূত্রের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। সাধারণতঃ পাতঞ্জল দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য ও কপিলসাংখ্যকে নিরীশ্বর সাংখ্য

---

* ম্যাক্সমূলার ভারতে ভট্ট মোক্ষমূলর নামে খ্যাত। জগদ্বিখ্যাত আচার্য্যগণের মধ্যে মোক্ষমূলরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ চতুর্ব্বেদের প্রতীচ্যে বিশেষ প্রচারের তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। জার্ম্মানদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও ইংলণ্ডকেই তিনি প্রধান কর্ম্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করেন এবং আমরণ সেইখানেই অবস্থান করিয়া নিজের জগদ্বিখ্যাত পাণ্ডিত্য প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত আকৃতি এবং সংস্কৃতানুরাগ ভারতবাসিগণকে এরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল যে, সুপ্রসিদ্ধ সার রাধাকান্তদেবের পুত্রগণ তাঁহাদের পিতার শ্রাদ্ধের বিদায়স্বরূপ বহুমূল্য শাল ও রৌপ্যকলস তাঁহাকে প্রেরণ করেন। The sacred Books of the East নামক পঞ্চাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থরাজি তিনি সম্পাদন করেন। অচিরকাল মধ্যে কাউয়েলের সহিত তাঁহার চিরস্থায়ী প্রগাঢ় সৌহৃদ্য জন্মিয়া যায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মোক্ষমূলরের মৃত্যু হয়। গার্টন কলেজে "কাউয়েলগিফ্‌ট" নামক কাউয়েল প্রদত্ত পুস্তকাবলী মধ্যে মোক্ষমূলর প্রণীত জাতকমালা নামক পুস্তকটী দৃষ্ট হয়, উহাতে "E. B Cowell from his very old friend F, Max Muller 25 nov 98" কথা কয়েকটী লিখিত আছে।

বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কেন এরূপ পার্থক্য করা হইল তাহার কারণ বুঝা কঠিন, কারণ পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে কপিলসাংখ্য নিরীশ্বর নহে, এবং মহাভারত হইতেও ইহা পাওয়া যায় যে সাংখ্য ও যোগদর্শনে কোনও পার্থক্য নাই—ইহারা একই উপদেশ দান করিতেছে। সম্ভবতঃ কারণ এই যে, এরূপ পার্থক্য বোধ হয় সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের কতকগুলি সূত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে (আমরা পূর্ব্বে ইহার আলোচনা করিয়াছি); অথবা কপিলসাংখ্যে ঈশ্বরকে জীবের মুক্তির জন্য আবশ্যক বলিয়া ধরা হয় নাই, কারণ এখানে জীবের মোক্ষসাধনই প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু যোগ-দর্শনে জীবের মুক্তির জন্য ঈশ্বরকে স্পষ্টই স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং 'নিরীশ্বর সাংখ্য' অর্থে এই বুঝা উচিত যে, ইহা জীবের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের আবশ্যকতা স্বীকার করে না, এবং 'সেশ্বর সাংখ্য' অর্থে যাহা এরূপ আবশ্যকতা স্বীকার করে। পাতঞ্জল দর্শনের বহু স্থানেই এরূপ আবশ্যকতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, আমরা এখানে সেগুলি আলোচনা করিব।

(১) 'ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা', অর্থাৎ "ভক্তিবিশেষ দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনায় সমাধি ও তৎফললাভ আসন্নতম হয়"। (২) 'অথ প্রধান-পুরুষব্যতিরিক্তঃ কোঽয়মীশ্বরো নামেতি'? অর্থাৎ "প্রধান ও পুরুষ ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর কে?" (৩) "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ", অর্থাৎ, "ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় হইতে নিত্যমুক্ত পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে", এখানে 'পুরুষবিশেষ' এই কথাটী লক্ষ্য করিতে হইবে। ব্যাসদেব ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—"কৈবল্যং প্রাপ্তাস্তর্হি সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ, তেহি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ। ঈশ্বরস্য চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী; যথা মুক্তস্য পূর্ব্বা বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে, নৈবমীশ্বরস্য। যথা বা প্রকৃতিলীনস্য উত্তরা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে, নৈবমীশ্বরস্য; সতু সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি"। অর্থাৎ (ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে) কৈবল্যাবস্থাপ্রাপ্ত অনেক পুরুষ আছেন যাঁহারা ত্রিবিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর তদ্রূপ নহেন, কারণ তাঁহার বন্ধনসম্বন্ধ কখনও হয় নাই, হইবেও না; মুক্তি বলিলেই পূর্ব্বে বন্ধন ছিল একথা বুঝিতে হইবে; কিন্তু এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সেরূপ সম্ভাবনা নাই, তাঁহার কখনও বন্ধন ছিল না। অধিকন্তু, প্রকৃতিলীন পুরুষেরও একপ্রকার দুঃখ-নির্ম্মুক্তাবস্থা হয়, কিন্তু তাহাদের পুনরায় বন্ধন ঘটিয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সেরূপ সম্ভব নহে, তিনি নিত্যই মুক্ত এবং স্বপ্রতিষ্ঠ।" (৪) "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং", অর্থাৎ "তাঁহাতে (ঈশ্বরেতে) সর্ব্বজ্ঞতার বীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে"। (৫) "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ", অর্থাৎ "ঈশ্বর প্রাচীনদিগেরও উপদেষ্টা, কারণ কালশক্তি তাঁহাতে অস্তমিত"। (সমাধিপাদ, ২৩—২৭ সূঃ)। ঈশ্বরের কথা অন্যান্য সূত্রেও আছে, যথা ১ ও ৩২ (সাধনাপাদ), ৬ (বিভূতিপাদ); কিন্তু এখানে সেগুলির উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। যে সূত্রগুলি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে পাতঞ্জল দর্শন জীবের মুক্তির জন্য ঈশ্বরাস্তিত্ব ও তাঁহার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন; ইহাও স্পষ্ট যে পাতঞ্জলদর্শনে দুই প্রকার পুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে—পরমপুরুষ ও জীবপুরুষ। এই দুয়ের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা পরে বিবেচনা করিব। কিন্তু এখানে একথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে পাতঞ্জল এ কথা বলিতেছে না যে মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বর একান্ত আবশ্যক, কেবল ভক্তিবিশেষ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিলে তাহাদের মুক্তিলাভ আসন্নতম হয়। এখানে 'বা' এই কথাটী লক্ষ্য করিতে হইবে। 'বা'-শব্দে বুঝাইতেছে যে মুক্তিলাভের আরও অন্য উপায়ও আছে যাহার মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা অন্যতম। এতৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে সমাধিপাদের ২১ ও ২২ সূত্র দ্রষ্টব্য। সুতরাং এই সম্বন্ধে সাংখ্য ও পাতঞ্জলে বাস্তবিকপক্ষে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩০১—৩১৮ অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের একটী সুন্দর বিবরণ দেখা যায়। ৩০১ অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের উচ্চ প্রশংসা আছে, এবং সাংখ্যজ্ঞানেরও খুব বিস্তৃত বর্ণনা আছে, এমন কি সাংখ্যজ্ঞানকে স্বয়ং ব্রহ্মই বলা হইয়াছে। আমি এখানে সেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি "সাংখ্যাঃ রাজন্মহাপ্রাজ্ঞাঃ গচ্ছন্তি পরমাং গতিং। জ্ঞানেনানেন কৌন্তেয় তুল্যং জ্ঞানং ন বিদ্যতে॥ অত্র তে সংশয়ো মা ভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরমং মতম্। অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ অনাদি-মধ্য-নিধনং নির্দ্বন্দ্বং কর্ত্তৃশাশ্বতম্। কূটস্থঞ্চৈব নিত্যঞ্চ যদ্বদন্তি মনীষিণঃ॥ ...... অমূর্ত্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্ত্তিরিতি শ্রুতিঃ। অভিজ্ঞানানি তস্যাহুর্মতং হি ভরতর্ষভ॥ .... জ্ঞানং মহদ্যদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে। যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥ যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপ শিষ্টজুষ্টে। জ্ঞানঞ্চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন্"॥ অর্থাৎ "হে রাজন্, সাংখ্যেরা মহাপ্রাজ্ঞ।

এই জ্ঞান দ্বারা তাহারা পরমগতি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! ইহার তুল্য আর কোনও জ্ঞান নাই। সাংখ্যে যে জ্ঞানের কথা আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ হও। সেই জ্ঞানকে অক্ষর, ধ্রুব, নিত্য ও পূর্ণব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহার আদি মধ্য ও অন্ত নাই। ইহা সকল দ্বন্দ্বের অতীত এবং ইহা জগতের শাশ্বত কারণ। ইহা নিত্য ও পূর্ণ; ইহা একরূপ ও চিরস্থায়ী। জ্ঞানীরা এইরূপে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। হে কুন্তিপুত্র! শ্রুতি বলেন—সাংখ্য সেই অমূর্ত্তের মূর্ত্তিস্বরূপ। হে ভরতর্ষভ! এরূপ কথিত আছে যে সাংখ্যে যে জ্ঞানের কথা আছে, তাহা ব্রহ্মেরই উপদেশ। হে রাজন্! যে উচ্চ জ্ঞানের কথা ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের সমীপে ও বেদে পাওয়া যায়, এবং যাহা অন্যান্য শাস্ত্রেও দেখা যায়, যাহা যোগে আছে এবং যাহা বিভিন্ন পুরাণে উক্ত হইয়াছে—এ সমস্তই সাংখ্যদর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাহা কিছু জ্ঞানের কথা ইতিহাসে, অর্থশাস্ত্রে ও এই পৃথিবীতে আছে তাহার সমস্তই সাংখ্যের উচ্চজ্ঞান হইতে গৃহীত।"

উপরি লিখিত শ্লোকগুলি হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হওয়া দূরে থাকুক, ইহাতে যে জ্ঞানের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের সহিত একীভূত করা হইয়াছে এবং ইহাকে ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপই বলা হইয়াছে। এমন কি, বেদে যে ঈশ্বরজ্ঞানের কথা আছে তাহাও সাংখ্য হইতে গৃহীত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে বশিষ্ঠ মুনি যাহা বলিয়াছেন তাহা দ্বারা উপরি-উক্ত মতটী অধিকতর সমর্থিত হইতেছে। শ্লোকগুলি এই "পঞ্চবিংশতিমো বিষ্ণুর্নিস্তত্ত্বস্তত্ত্বসংজ্ঞিতঃ। তত্ত্বং সংশ্রয়নাদেতত্তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ॥ যন্মর্ত্ত্যমসৃজদ্ব্যক্তং তত্তন্মূর্ত্ত্যাধিতিষ্ঠতি। চতুর্বিংশতিমোঽব্যক্তো হ্যমূর্ত্তঃ পঞ্চবিংশকঃ॥ স এব হৃদি সর্ব্বাসু মূর্ত্তিষ্বাতিষ্ঠতেত্মবান্। কেবলশ্চেতনোনিত্যঃ সর্ব্বমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্। সর্গপ্রলয়ধর্ম্মিণ্যা স সর্গপ্রলয়াত্মকঃ। গোচরে বর্ত্ততে নিত্যং নির্গুণং গুণসংজ্ঞিতম্॥ এবমেষো মহানাত্মা সর্গপ্রলয়কোবিদঃ। বিকুর্ব্বাণঃ প্রকৃতিমানভিমন্যত্যবুদ্ধিমান্॥" মভা, ৩০২অঃ, ৩৮—৪২শ্লোঃ)। অর্থাৎ, "যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত পঞ্চবিংশ তত্ত্ব হইতেছেন বিষ্ণু বা ঈশ্বর। সেই বিষ্ণু সমস্ত গুণ-বর্জ্জিত হওয়ায় কোনও তত্ত্ব নহেন, যদিও তিনি সকল তত্ত্বকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান বলিয়া সুধীরা তাঁহাকে একটী তত্ত্ব বলিয়াছেন। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেছে সকল মর্ত্ত্য ও প্রকাশবান্ বস্তুর কারণ এবং উহাদের শরীরেই ইহা বর্ত্তমান; কিন্তু পুরুষ নিরাকার। যদিও পুরুষ আত্মা, তথাপি তিনি সকলের অন্তরে ও সকল রূপেতেই বর্ত্তমান; তিনি মুক্ত, চেতন, নিত্য এবং যদিও স্বয়ং আকারবিহীন তথাপি তিনি সকল প্রকার আকারই পরিগ্রহ করেন। যে প্রকৃতি সকল সর্গ ও প্রলয়ের কারণ তাহার সহিত যুক্ত হইয়া পুরুষও সর্গ ও প্রলয়ের কর্ত্তৃত্বরূপ ধারণ করেন। এবং এইরূপ সংযোগ হেতু তিনি নিত্য হইলেও কালেতে অবস্থিতি করেন, এবং যদিও তিনি স্বতঃ গুণবর্জ্জিত তথাপি গুণযুক্ত হয়েন। এই প্রকারে সেই পরমাত্মা অবিদ্যা হেতু নিজেকে সর্গ ও প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং পরিবর্ত্তনীয় ও প্রকৃতিলীন হয়েন।" উপরি-উক্ত শ্লোকগুলিতে একথা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে যে পুরুষ—যাঁহাকে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব বলা হইয়াছে—তিনি বস্তুতঃ বিষ্ণু বা ঈশ্বর, তিনি কোনও তত্ত্ব নহেন। তিনি কোনও বিশিষ্ট অন্তরে বা রূপে বর্ত্তমান নহেন, তিনি সকল অন্তরে ও রূপে বর্ত্তমান। তিনি সকল রূপই ধারণ করেন এবং সকল সর্গ ও প্রলয়েরও কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং একথা বলা হইল যে, জীবসকল বিভিন্ন উপাধিধারী ও বিভিন্ন উপায়ে সীমাবদ্ধ বস্তুতে কার্য্যকারী ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। বশিষ্ঠ নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে এই বাক্যটী একটী উপমা দ্বারা সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন। শ্লোকটী এই—"কোষকারো যথাত্মানং কীটঃ সমবরুন্ধতি। সূত্রতন্তুগুণৈর্নিত্যং তথায়মগুণো গুণৈঃ" (মভাঃ ৩০৩ অঃ, ৪শ্লোঃ), অর্থাৎ, "গুটীপোকা যেরূপ নিজ সূত্রের দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে নিজেকে বদ্ধ করে, সেইরূপ ঈশ্বরও গুণাতীত হইলেও নিজেকে চতুর্দ্দিক হইতে গুণের দ্বারা বদ্ধ করেন"।

বশিষ্ঠ মুনি নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে যাহা বলিয়াছেন তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক্। এগুলিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অধিকতর স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে; সেগুলি এই—"যদাহ্যেষ গুণানেতান্ প্রাকৃতানভিমন্যতে। তদা স গুণহানৈন্য তং পরমেবানুপশ্যতি" (৩০৫ অঃ, ৩০ শ্লোঃ), অর্থাৎ, "যখন জীব মনে করে যে ঐ সকল গুণ প্রকৃতির, কেবল তখনই সেগুলিকে জয় করিবার নিমিত্ত জীব ঈশ্বরকে দর্শন করে"। পুনশ্চ—"পঞ্চবিংশতিনিষ্ঠোঽয়ং যদা সম্যক্ প্রবর্ত্ততে। একত্বং দর্শনঞ্চাস্য নানাত্বঞ্চাপ্যদর্শনম্॥ তত্ত্বনিস্তত্ত্বয়োরেতৎ পৃথগেব নিদর্শনম্। পঞ্চবিংশতিসর্গন্তু তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ॥ নিস্তত্ত্বং পঞ্চবিংশস্য পরমাহুর্নিদর্শনম্। সর্গস্য বর্গমাচারং তত্ত্বং তত্ত্বাৎ সনাতনম্" (৩৭, ৩৮ ও ৩৯ শ্লো. দেখ)। অর্থাৎ, "যখন কেহ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আলোচনা করে, ও বুঝিতে আরম্ভ করে তখন সে বুঝিতে পারে যে, পুরুষের একত্ব শাস্ত্রের (সাংখ্যদর্শনের) সহিত সমঞ্জস এবং পুরুষের বহুত্ব এই শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। এইগুলি

হইতেছে তত্ত্বসমূহের বিভিন্ন প্রকৃতি (বা ধর্ম্ম) এবং ইহাদের অতিরিক্ত যাহা; জ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে এই তত্ত্বগুলি হইতেছে পঞ্চবিংশতি সর্গ, এবং যাহা সর্গ নহে অথবা যাহা সর্গের অতীত তাহা হইতেছে ষড়্‌বিংশ, অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। পঞ্চবিংশতি সর্গকে তত্ত্ব বলা হয়, এবং যাহা ইহার অতীত তাহাই হইতেছে নিত্যেশ্বর"। এখানে একথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এমন কি, পঞ্চবিংশতত্ত্ব অর্থাৎ জীবকেও একটী তত্ত্ব বলিয়া ধরা হয়, এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্বভাবতঃ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু এই অসামঞ্জস্য বাস্তব নহে, কারণ জীব ত্রিগুণান্বিত ঈশ্বর, সুতরাং জীবকে দুইভাবে দেখা যায়—জীবরূপে তিনি একটী তত্ত্ব, কিন্তু উপাধিবর্জ্জিত বা উপাধির অতীতরূপে তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। ঈশ্বর ও জীবের অভিন্নত্ব নিম্নলিখিত সূত্রগুলিতে আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। যথা—"অয়মত্র ভবেদ্বন্ধুরনেন সহ যে ক্ষমম্। সাম্যমেকত্বমায়াতো যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বম্॥ তুল্যতামিহ পশ্যামি সদৃশোঽহমনেন বৈ। অয়ং হি বিমলো ব্যক্তমহমীদৃশকস্তথা।" ॥ (সভা ৩০৭ অঃ, ২৭ ও ২৭ শ্লো)। অর্থাৎ, "কেবল পরমপুরুষই আমার বন্ধু। আমি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারি। আমার স্বভাব যাহাই হউক না কেন, এবং আমি যেই হই না কেন, আমি তাঁহার মত হইতে পারি এবং তাঁহার সহিত একও হইতে পারি। তাঁহার সহিত আমার সাদৃশ্য আমি দেখিতে পাইতেছি; বাস্তবিক আমি তাঁহারই মত। তিনি শুদ্ধ; ইহাও স্পষ্ট যে আমিও ঐরূপ।"

সাংখ্য সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের কথোপকথনেও আমরা ঐ এক সিদ্ধান্তই দেখিতে পাই। যথা—"অব্যক্তরূপো ভগবান্ শতধা চ সহস্রধা। শতধা সহস্রধা চৈব তথা শতসহস্রধা। কোটিশশ্চ করোত্যেষ প্রত্যগাত্মানমাত্মনা।" (মভা, ৩১৪অঃ, ২শ্লোঃ), অর্থাৎ, "অব্যক্ত ঈশ্বর নিজেকে (অন্তরাত্মাকে) নিজের দ্বারা শত, সহস্র লক্ষ ও কোটিরূপে পরিণত করেন।" পুনশ্চ—"যদাপ্রপশ্যতেঽন্যত্ত্বমন্যহানি কাশ্যপ। তদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি॥ অন্যশ্চ শাশ্বতোঽব্যক্তস্তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ। তস্য দ্বাবনুপশ্যেতাম্ তমেকমিতি সাধবঃ॥ তে নৈতন্নাভিসন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্। জন্মমৃত্যুভয়োদ্বেগাঃ সাংখ্যাশ্চ পরমৈষিণঃ॥" (মভা, ৩১০অঃ, ৫৫—৫৭ শ্লোঃ)। অর্থাৎ, "হে কাশ্যপ, যদি কেহ সর্ব্বদা জীবের বিষয় ও পরমাত্মার সহিত ইহার সম্বন্ধের বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে সে ত্রিবিধ দুঃখ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে ও পরমাত্মাকে দেখিতে পায়। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা অব্যক্ত পরমপুরুষকে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু সুধীরা ঈশ্বর ও জীবকে অভিন্ন বলিয়াই দেখেন। পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া সাংখ্যেরা ও যোগীরা ঈশ্বর ও জীবকে অভিন্ন বলিয়াই বিবেচনা করেন।"

মহাভারতের
নীতি-বাক্য।

(৺অনাথকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

সভাপর্ব্ব।

বিদুর।—এই ভূমণ্ডলে প্রিয়ভাষী পাপাত্মা মনুষ্য অনেক আছে, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা নিতান্ত দুর্লভ।

যে ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া হিতকর অপ্রিয় বাক্য কহে সে-ই যথার্থ সহায়। (দ্যূতপর্ব্বাধ্যায়—২২২

বিদুর।—অন্যের মর্ম্মপীড়া দিবে না। কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য কহিবে না। সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না। এবং যে কথা কহিলে অন্যে বিরক্ত হয় এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিবে না। (ঐ—২২৯

বিদুর।—কাপুরুষেরাই শত্রুর শস্ত্রাঘাত সহ্য করে। (ঐ

দ্রৌপদী।—পৃথ্বীতলে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (ঐ—২৩২

দ্রৌপদী।—লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু। (ঐ—২৫৮

ধৃতরাষ্ট্র।—যাঁহারা বৈরাচরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণ দর্শন করেন এবং বিরোধে লিপ্ত নহেন, তাঁহারাই উত্তম পুরুষ।

ধৃতরাষ্ট্র।—সাধুগণ বৈরাচরণ বিস্মরণপূর্ব্বক কেবল শত্রুকৃত সৎকার্য্যেরই স্মরণ করিয়া পরোপকারানুরোধে প্রতীকারপরাঙ্মুখ থাকেন। (ঐ—২৬৩

যুধিষ্ঠির।—লোকে দৈববশে শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে। (ঐ—২৬৮

বৈশম্পায়ন।—বিপৎকাল আসন্ন হইলে প্রায়ই বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। (ঐ

বিদুর।—নিশ্চয় জানিবে, অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক কেহ জয়লাভ করিতে পারে না। (অনুদ্যূতপর্ব্বাধ্যায়—২৭৭

ধৃতরাষ্ট্র।—যেখানে বুদ্ধি সেইখানেই ক্ষমা। (দ্যূতপর্ব্বাধ্যায়—২৬১

বনপর্ব্ব।

পৌরাণ।—যেমন বস্ত্র জল তিল ও ভূমি কুসুম-

সংসর্গে সুরভিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান করিতে পারে।

মূঢ়সমাগম কেবল মোহজালের আকর, নিত্য সাধু-সমাগম কেবল ধর্ম্মের আবহ। অতএব প্রজ্ঞাশীল বৃদ্ধ সুশীল ও শমপরায়ণ সাধুগণের সহবাসই কর্ত্তব্য।

অসাধু ব্যক্তিকে দর্শন স্পর্শন এবং তাহার সহিত আলাপ ও সহবাস করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়।

(আরণ্যক পর্ব্বাধ্যায়—৩

শৌনক।—স্নেহ মানসিক দুঃখের মূল; জন্তুগণ স্নেহপরতন্ত্র হইয়া দুঃখপ্রাপ্ত হয়। স্নেহ কেবল দুঃখেরই মূল এমত নহে, উহা ভয় শোক হর্ষ এবং আয়াসেরও প্রবর্ত্তক।

স্নেহ হইতে মনের বিকৃতি ও বিষয়াসক্তি উৎপন্ন হয়।

কোঠরস্থিত অগ্নি যেমন বৃক্ষের সমুদায় অংশ ভস্মসাৎ করে সেইরূপ বিষয়াসক্তি অত্যল্প হইলেও সমুদায় ধর্ম্মার্থ ধ্বংস করিয়া থাকে।

অর্থসঞ্চয় দ্বারা মিত্রগণ হইতে স্নেহলাভ করিবার অভিলাষ করিবে না; এবং জ্ঞান দ্বারা স্বীয় স্নেহকে বিনিবর্ত্তিত করিবে।

জল যেমন পদ্মপত্রে সংসক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ স্নেহও জ্ঞানবান কৃতাত্মা শাস্ত্রজ্ঞ যোগীকে আসক্ত হইতে পারে না। (ঐ—৮

যে মনুষ্য অর্থে একান্ত আসক্ত, সে অন্য কোন প্রকার শ্রেয়ই লাভ করিতে পারে না। এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বপ্রকার অর্থাগমকে লোভ মোহ কৃপণতা দর্প অভিমান ভয় ও উদ্বেগের মূলীভূত বলিয়া জানেন।

মূঢ় ব্যক্তিরাই অসন্তোষপরায়ণ হয়, পণ্ডিতগণ সতত সন্তুষ্ট থাকেন; পিপাসার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ। (ঐ—৯

রূপ যৌবন রত্নসঞ্চয় ঐশ্বর্য্য এবং প্রিয়নিবাস সকলই অনিত্য। (ঐ

শৌনক।—যিনি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ। পঙ্কলিপ্ত হইয়া পুনরায় তাহা প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই উচিত।

(আরণ্যক পর্ব্বাধ্যায়—১০

সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হও; যদি ধর্ম্মোপার্জ্জনে অভিলাষ থাকে তাহা হইলে অর্থাকাংক্ষা পরিত্যাগ কর। (ঐ

যুধিষ্ঠির।—সাধুগণের গৃহে তৃণ ভূমি জল ও সুনৃত বাক্য এই চারি দ্রব্যের কোন কালেই অপ্রতুল থাকে না।

গৃহস্থ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্ত ব্যক্তিকে আসন, তৃষিত ব্যক্তিকে পানীয়, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন ও অভ্যাগত ব্যক্তিকে নয়ন ও মনপ্রিয় বচন এবং উত্থান-পূর্ব্বক আসন প্রদান করিবেন; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

(ঐ—১০

বৃথা পশুহিংসা করিবে না। (ঐ—১১

সায়ং ও প্রাতঃকালে কুক্কুর, চণ্ডাল এবং পক্ষীগণের উদ্দেশে ভূমিতে অন্নবপনরূপ বৈশ্বদেব নামক বলি প্রদান করিবে। (ঐ

শৌনক।—যেমন দুষ্ট অশ্ব সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্তচেতা মনুষ্যকে কুপথগামী করে। (ঐ

যুধিষ্ঠির।—যে ব্যক্তি অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রান্ত পথিককে অবিশ্রান্ত অন্ন দান করেন তিনিই মহৎ পুণ্যফল লাভ করেন।

(ঐ

শৌনক।—অভিমান সহকারে ধর্ম্মাচরণ করিবে না।

যজ্ঞ অধ্যয়ন দান তপ সত্য ক্ষমা দম এবং অলোভ এই অষ্টপ্রকার ধর্ম্মের পথ। (ঐ—১২

ধৃতরাষ্ট্র।—কুলটা স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। (ঐ—২৩

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়-সম্পত্তি।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকাহিনীর সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া এ বিষয়টি আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে। এ জন্য ইহার আলোচনা করা যাইতেছে। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে সকল ঘটনা যথাযথভাবে স্মরণ করিতে পারেন নাই। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বহু বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা বলিতে গিয়া সকলেরই কিছু কিছু ভুল হইয়া যায়। তদুপরি মনে রাখিতে হইবে যে ১৮ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১।৩২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের মন ধর্ম্ম লইয়া একেবারে উন্মত্ত ছিল; এই সময়ে তিনি বিষয়সম্পত্তির দিকে মন দিতে, তাহার কথা শুনিতে ও ভাবিতে, ভাল বাসিতেন না। পিতার মৃত্যুর কিছু কাল পরে যখন পিতার ব্যবসায়টির পতন হইল, তখনও তিনি 'যাক্, যাক্, যাক্' বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিষয়ের জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইতেই ব্যস্ত ছিলেন। মানুষ যাহাকে মন দিয়া ধরে না, তাহার সম্বন্ধে তাহার স্মৃতিও

অস্পষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য বিষয়ের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া স্থানে স্থানে মহর্ষির ভুল হইয়া গিয়াছে।

এই প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিত Memoir of Dwarkanath Tagore নামক গ্রন্থকে সংক্ষেপে "Mem." বলিয়া, এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্পাদিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' পুস্তকের ব্রাহ্মণকাণ্ডের ষষ্ঠ খণ্ডকে ('পিরালীব্রাহ্মণ বিবরণ') সংক্ষেপে "ব জা ই ব্রা, ৬" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে। সমসাময়িক সংবাদপত্রাদির নাম পূর্ণভাবে উল্লিখিত হইবে। এই প্রবন্ধের referenceগুলি লিখিবার সময় সর্ব্বত্র আমি নিজে মূল দেখিয়া লিখিয়া লইয়াছি; অপর কোনও পুস্তকে বা পত্রিকায় 'উদ্ধৃত' কোনও উক্তি হইতে কিছুই গ্রহণ করি নাই। মহর্ষির আত্মজীবনীর উল্লেখ থাকিলে, তাহা ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

দ্বারকানাথের চাকরী, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, ও দেবেন্দ্রনাথকে ব্যাঙ্কের কর্ম্মে নিয়োগ।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর চব্বিশ পরগণার কালেক্টার ও লবণ মহালের অধ্যক্ষ (Salt Agent) Mr. Plowdenএর দেওয়ান নিযুক্ত হন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যদক্ষতা ও সংসারের অভিজ্ঞতা দর্শনে, তাঁহার পাঠ্যাবস্থার দুই প্রধান সহায় ও তৎকালীন Commercial Bankএর পরিচালকমণ্ডলীর (Mackintosh & Co's) দুই প্রধান পুরুষ J. G. Gordon এবং James Calder, স্বয়ং অগ্রসর হইয়া ১৮২৮ সালে তাঁহাকে আপনাদের (Mackintosh & Co's) অংশীদার করিয়া লন। ইহাতে দ্বারকানাথ উক্ত Commercial Bankএরও একজন পরিচালক হইলেন। কিন্তু এই গৌরবময় দায়িত্ব ভবিষ্যতে তাঁহার অনেক আর্থিক ক্ষতির কারণ হইয়াছিল।

১৮২৯ সালে তাঁহার সরকারী চাকরীতে আরও পদোন্নতি হইল; তিনি Customs, Salt and Opium Boardএর দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি কয়েক মাসের অধিক এ চাকরী করেন নাই।

দ্বারকানাথ যে বৎসর ম্যাকিন্টশ কোম্পানীর অংশীদার হন, তার পর বৎসরই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ইতিহাস বর্ণনা সূত্রে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলিতেছেন, "মিঃ জে জি গর্ডন, জে কলডার, জন্ পামার, কর্নেল জেমস্ ইয়ং, এবং দ্বারকানাথ, এই পাঁচ জন এই ব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তক ও প্রথম বোর্ড অব্ ডিরেক্টার্স্ ছিলেন। Exchange Hallএ ইঁহাদের প্রথম অধিবেশন হয়; তাহাতে ইঁহারা উইলিয়ম্ কার্ সাহেবকে ব্যাঙ্কের সম্পাদক ও রমানাথ ঠাকুরকে ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।"

কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের এই উক্তি নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। তিনি Cook সাহেব রচিত যে পুস্তকের উপরে নির্ভর করিয়া এই কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে সব কথা খুলিয়া লিখা হয় নাই। দ্বারকানাথের নিকট-আত্মীয়গণের কাছে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে যখন ১৮২৯ সালে Union Bank প্রথম স্থাপিত হয়, তখন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে দ্বারকানাথের নাম ছিল না। ১৮৩৩ সালে যখন ঐ Bank "reconstituted" হয়, তখন দ্বারকানাথ প্রকাশ্য ভাবে উহার ডিরেক্টর হন। গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান বলিয়া তিনি প্রথম প্রথম প্রকাশ্য ভাবে ব্যাঙ্কে যোগ দিতে পারেন নাই, এবং সেই কারণে তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার ভ্রাতা রমানাথকে আলিপুরের সেরেস্তাদারের আফিস হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া ব্যাঙ্কের Treasurer নিযুক্ত করা হয়। প্রথম অনুষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে হরিমোহন ঠাকুর ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে যোগ না দিলেও দ্বারকানাথ প্রথম হইতেই ব্যাঙ্কের প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

"১৫ লক্ষ সিক্কা টাকা (কোম্পানীর ১৬ লক্ষ টাকার সমান) মূলধন লইয়া ১৮২৯ সালের ১৭ই আগষ্ট এই ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হয়।* ইহার অংশীদারদের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন। যৌথ-কারবারের প্রণালীতে ইহার কাজ চলিত। তৎকালীন অর্দ্ধসরকারী বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সনন্দ (charter) এমন সকল কঠিন সর্ত্তে আবদ্ধ ছিল যে ঐ ব্যাঙ্ক ব্যবসাবাণিজ্যের সাহায্যার্থ টাকা ধার দিতে পারিত না। এই কারণে বিশেষভাবে কৃষি ও বাণিজ্যের সাহায্যের জন্যই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। সে সময়ে কলিকাতায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ছাড়া "কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক" ও "কলিকাতা ব্যাঙ্ক" নামে আর দুইটি ব্যাঙ্ক ছিল। এই দুই ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন ব্যাঙ্কের কাজের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কার্য্যক্ষেত্র কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করা হইল, এবং কলিকাতা ব্যাঙ্ক একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইল।

১৮৩৩ সালে ম্যাকিন্টশ্ কোং (এবং তৎসহ কমার্শিয়াল্ ব্যাঙ্ক) ফেল হইল। তাহার অংশীদারগণের মধ্যে একমাত্র দ্বারকানাথেরই আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল; তাঁহার উপরেই কমার্শিয়াল্ ব্যাঙ্কের সমুদয় দায় শোধের গুরু ভার পড়িয়া গেল।

---

* ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের "Bengal Directory" তে আছে যে Union Bank ১ লা আগষ্ট ১৮২৯ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অল্প কালের মধ্যেই নবপ্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান সহায় হইয়া উঠিল, এবং দ্বারকানাথ এই ব্যাঙ্কের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। অনেকবার তিনি এই ব্যাঙ্ককে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। একবার একজন কর্ম্মচারী অনেক টাকা আত্মসাৎ করে; দ্বারকানাথ স্বয়ং ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়া দুর্নাম হইতে ব্যাঙ্ককে রক্ষা করেন।"—(Mem. 13, 14; সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

দেবেন্দ্রনাথ কতদিন এই ব্যাঙ্কে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। সতেরো বৎসর বয়সে তিনি পিতা কর্ত্তৃক এই ব্যাঙ্কের কার্য্যে নিযুক্ত হন। "দেবেন্দ্রনাথকে পাকা বৈষয়িক করিবার জন্য দ্বারকানাথ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে তাঁহাকে প্রতিদিন কেরাণীর কাজ করিতে হইত, তহবিল মিলাইতে হইত, হিসাব রাখিতে হইত। হিসাবের কাজে তিনি এমনি পাকা হইয়া গিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সেও কানে শুনিয়াও তিনি সমস্ত হিসাব বুঝিতে পারিতেন;" (অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রচিত মহর্ষির জীবনী ৮২পৃঃ)।

কার ঠাকুর কোম্পানী, জমিদারী ও কারখানা।

১৮৩৪ সালের জুলাই মাসে দ্বারকানাথ আরও মুক্তভাবে স্বাধীন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার গৌরব-জনক ও লাভজনক সরকারী চাকরীটি (Customs, Salt and Opium Boardএর দেওয়ানী) পরিত্যাগ করিলেন। বোর্ড তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও অভিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

"সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দ্বারকানাথ অল্প দিনের মধ্যেই কার ঠাকুর কোম্পানী (Carr, Tagore & Co.)নামক হৌস্ স্থাপন করেন। দেশীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথম কলিকাতা নগরীতে য়ুরোপীয় আদর্শে ব্যবসায়ের কুঠি প্রতিষ্ঠা করিলেন বলিয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর দ্বারকানাথকে বহু প্রশংসা ও সাধুবাদ করিয়া এক পত্র লিখেন। তিনি যে সর্ব্বাংশে এ প্রশংসার যোগ্য ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পূর্ব্বে দেশীয় ধনী ব্যবসায়ীদিগের চরম আকাঙ্ক্ষা এই ছিল যে তাঁহারা য়ুরোপীয় হৌসের বেনিয়ান হইয়া টাকা যোগাইবেন, মুচ্ছুদ্দি হইয়া জিনিস যোগাইবেন এবং দস্তরীটুকু মাত্র লাভ করিবেন। স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করা অথবা নিজ দায়িত্বে জাহাজ বোঝাই করিয়া বিলাতে মাল পাঠানো তখন তাঁহাদের কল্পনায় আসিত না।

দ্বারকানাথ মিঃ উইলিয়ম্ কার, ও মিঃ উইলিয়ম্ প্রিন্সেপ এই তিনজন কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রথম অংশীদার ছিলেন। পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মেজর হেণ্ডার্‌সন্, মিঃ প্লাউডেন্, ডাঃ ম্যাক্‌ফার্সন্, কাপ্তান টেলার্, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইহার অংশীদার করিয়া লওয়া হয়। মিঃ ডি এম্ গর্ডন ও বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইহার কর্ম্মচারী ছিলেন। ডি এম্ গর্ডন ইহার কর্ম্মেই নিযুক্ত হইলেন ও ক্রমশঃ ইহার অংশীদারের পদবীতে উন্নীত হইলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ক্রমে বাণিজ্যের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে তাহা দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন।

কিন্তু দ্বারকানাথই কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ইহার কাজকর্ম্ম তিনিই পরিচালন করিতেন এবং টাকাও তিনিই যোগাইতেন। এই কারবারের আর্থিক ব্যাপারে তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন; অন্য কোনও অংশীদারকে তিনি আর্থিক বিষয়ে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। দ্বারকানাথের নিজের অর্থবল, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহার যোগ এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও কুঠিতে তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস—এই সকলের ফলে, এই কারবারে যখন যত টাকার দরকার হউক না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইতে পারিতেন।

এই কারবারের সংস্রবে দ্বারকানাথ শিলাইদহে এবং অন্যান্য স্থানে নীলের কুঠি স্থাপন করেন। তাঁহার পৈতৃক জমিদারী কুমারখালিতে এখন গভর্ণমেণ্টের একটি রেশমের কুঠি ছিল। গভর্ণমেণ্টের রেশমের একচেটিয়া ব্যবসায় রহিত হইলে দ্বারকানাথ কুমারখালির কুঠি ক্রয় করিয়া লন এবং কার ঠাকুর কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাহা চালাইতে আরম্ভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রাণীগঞ্জে কয়লার খনি এবং রামনগরে একটি চিনির কারখানাও চালাইতেছিলেন।

দ্বারকানাথের পরিশ্রমশক্তি, বিচক্ষণতা ও মানুষের সহিত বুঝিয়া চলিবার সুবুদ্ধি অসাধারণ ছিল; তাঁহার অর্থবল এবং প্রতিপত্তিও অপরিমিত ছিল। এই জন্য অপ্রতিহত গতিতে কার ঠাকুর কোম্পানীর উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে সকল লোকে এই হৌসটিকেই তাৎকালীন বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলিয়া গণনা করিতে লাগিল।

দ্বারকানাথের জমিদারী কার্য্যের সফলতাও তাঁহার ব্যবসায়ের ও কারখানার সফলতার অনুরূপ হইয়াছিল। তিনি কারবারে প্রবেশ করিবার পর কয়েক বৎসরের

মধ্যেই নিম্নলিখিত জমিদারীসকল ক্রয় করেন :—রাজসাহী জেলার কালীগ্রাম; পাবনা জেলার শাহাজাদপুর; রঙ্গপুর জেলার স্বরূপপুর; [হুগলীতে] মণ্ডলঘাট পরগণার তেরো আনা অংশ, দ্বারবাসিনী ও জগদীশপুর; যশোহরে মহম্মদশাহী; কটকে পরগড়া প্রভৃতি।"—

(Mem, 10, 12, 15, 16; সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

দ্বারকানাথের ট্রষ্টডীড্।

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে তাহার দেনা দ্বারকানাথের স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছিল। যদিও এই ক্ষতি দ্বারকানাথের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক ছিল না, এবং কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি কলিকাতার একজন প্রধান ধনী ব্যক্তি ছিলেন. তথাপি এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সাবধান হইতে হইল যে, যদি কোন দিন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অথবা কার ঠাকুর কোম্পানী ফেল হয়, তবে আবার যেন ঐরূপ ঘটিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব না নষ্ট হয়। বিশেষতঃ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের তুলনায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এবং কার ঠাকুর কোম্পানির মূলধনও অনেক অধিক ছিল, এবং তাহাতে দ্বারকানাথের আর্থিক দায়িত্বও অনেক অধিক ছিল। এই কারণেই তিনি ১৮৪০ সালের ২০ শে আগষ্ট তারিখে একটী Deed of Settlement সম্পাদন করিয়া নিজের কতকগুলি সম্পত্তির উপরে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া তাহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাই দ্বারকানাথের ট্রষ্টডীড্।

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' পুস্তকে (ব. জা. ই. ব্রা. ৬। ৩২২-৩২৪, ফুটনোট) রামলোচন ঠাকুরের উইলের যে সম্পত্তিতালিকা প্রদত্ত আছে, এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের উইলের বর্ণনার ভিতরে এই Deed of Settlementএর অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তিগুলির যে উল্লেখ আছে, এই উভয়ের তুলনা করিলে দেখা যায় যে দ্বারকানাথ নিজের ৮টি পরগণা (অর্থাৎ অধিকাংশ সম্পত্তি) এই ট্রষ্টডীড্ভুক্ত করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (৭০ পৃঃ) এই সম্পত্তির সংখ্যা 'চারিটি' বলিয়া লিখিয়াছেন; তাহা ঠিক নহে।

ট্রষ্টডীড্ দ্বারা সম্পত্তি রক্ষা করিবার এই প্রয়াসের নানাবিধ কারণ ছিল। একটী কারণ এই যে, সেই সময়ে যৌথ কারবারের অংশীদারগণের মধ্যে আর্থিক দায়িত্ব ভাগ করিয়া দিবার জন্য, অথবা সমগ্র কারবারটীর আর্থিক দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার জন্য, কোনও প্রকার আইন ("লিমিটেড্" কোম্পানীর আইন) প্রচলিত ছিল না। কোনও কারবার ফেল হইলে, লিকুইডেটরগণ নিজ খামখেয়ালীর বশবর্ত্তী হইয়া, যে অংশীদারকে যত অধিক ধনী বলিয়া মনে করিতেন, তাহার উপরে তত অধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণের ভার নিক্ষেপ করিতেন। এই কারণেই গিরীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, (আত্মজীবনী ৭২ পৃষ্ঠা), "সাহেবদের তো কোন বিষয় বিভব পৃথক সম্পত্তি নাই। যদি কখন বাণিজ্যের পতন হয়, তবে মহাজনেরা আমাদিগকেই আসিয়া ধরিবে, আমাদেরই বিষয় আটক পড়িবে, আমাদিগকেই সকল টাকা বুঝাইয়া দিতে হইবে। দেনার দায়ে আমাদেরই বিষয় বিক্রয় হইয়া যাইবে। লাভের সময় এখন তাহারা ভাগী, কিন্তু ক্ষতির দায়ে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। লাভ খাইয়া তাহারা চলিয়া যাইবে, ক্ষতি গণনা করিয়া কেবল আমরাই যথাসর্ব্বস্ব দিতে থাকিব।"

সেই যুগে বাণিজ্য এবং জমিদারী, এই দ্বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হওয়াতে, কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত বংশের অতি দ্রুত উত্থান ও পতন সংঘটিত হইত। এই জন্য তৎকালীন ধনীদিগের মধ্যে এই প্রকার Deed of Settlement অথবা willএর দ্বারা পুত্রগণকে কেবল জীবন-স্বত্ব (life interest) এবং পৌত্রগণকে সম্পূর্ণ নিব্যূঢ় স্বত্ব (absolute proprietorship) প্রদান করা, একটি প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কেবল দ্বারকানাথ ঠাকুর নহেন, রমানাথ ঠাকুর, গোপাললাল ঠাকুর, প্রসিদ্ধ ডাক্তার দ্বারকানাথ গুপ্ত (ডি গুপ্ত), প্রভৃতি অনেকেই এইরূপ করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা বিষয়-সম্পত্তি অন্ততঃ দুই পুরুষের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত রক্ষা পাইবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

এই ব্যবস্থা হেতু, যখন গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ একা সমগ্র পরিবারের কর্ত্তা ও অভিভাবক হইলেন, তখনও, (তিনি কেবল জীবন-স্বত্ব-ভাগী বলিয়া) সম্পত্তির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অধিকার জন্মিল না। বহুকাল পরে সমুদয় উত্তরাধিকারীগণ একত্র কোর্টের সাহায্যে দেবেন্দ্রনাথকে এই অধিকার দান করেন; তখন এই অধিকারের বলে দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় উইলের দ্বারা সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন।

সাধারণতঃ পত্নীবিয়োগের পরে, অথবা যখন আর সন্তানাদি জন্মিয়া সম্পত্তির অংশীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকিত না এমন সময়ে, এইরূপ Deed of Settlement সম্পাদন করা হইত। দ্বারকানাথের পত্নীবিয়োগের তারিখ এখন আর জানিতে পারা যাইতেছে না; কিন্তু খুব সম্ভবতঃ তিনি পত্নী-বিয়োগের পরেই এই Deed সম্পাদন করেন।

ট্রষ্টডীড্ সম্পাদনের যে সকল কারণ এখানে প্রদর্শিত হইল, তাহা ব্যতীত আর একটী ইঙ্গিত দেবেন্দ্রনাথের

আত্মজীবনীর (৭০ পৃঃ) এই উক্তিতে পাওয়া যায়:—"তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি [দ্বারকানাথ] বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের [পুত্রগণের] হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না।" দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি আত্মাবমাননাপ্রসূত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। গিরীন্দ্রনাথ বিষয় সম্পত্তি পরিচালনে অতি সুদক্ষ ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেরূপ না হইলেও, পিতার এত অধিক অনাস্থাভাজন ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না; কারণ, দেখা যায় যে দ্বারকানাথ নিজ উইলে দেবেন্দ্রনাথকে স্বীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির একজন এক্‌জিকিউটার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের মুক্তহস্ততা ও ব্যয়শীলতা।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের জন্য দ্বারকানাথকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। ইহাকে রক্ষা করিতে গিয়া যে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত দ্বারকানাথ আইনঘটিত বিধি-ব্যবস্থায় এবং ব্যবসায় পরিচালনে যেরূপ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিতেন, কেহ ব্যক্তিগত দুঃখ নিবেদন করিতে আসিলে তাহাকে অর্থ দান করিবার সময় সে সতর্কতা ও বিচক্ষণতা রক্ষা করিতে পারিতেন না। সহৃদয়তা ও প্রতিপত্তি রক্ষার আকাঙ্ক্ষা, এই দুই মিলিয়া তাঁহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় মুক্তহস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু তাঁহার স্বদেশীয়গণই যে তাঁহার দান গ্রহণ করিতেন তাহা নহে। "অনেক সাহেব টাকা শোধ করিতে না পারিলে দ্বারকানাথের দয়াভিক্ষা করিতেন, এবং দ্বারকানাথ নিজে সেই দেনা শোধ দিতেন। ইহাতে যেমন আর্থিক ক্ষতি হইত, তেমনি প্রতিপত্তি লাভ হইত। সরকারী কর্ম্মচারী সকলেই এজন্য একপ্রকার তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সকলপ্রকার কার্য্যেই তাঁহার সাহায্য করিতেন।"

(ব. জা. ই ব্রা. ৬।৩৩২)।

দ্বারকানাথের মুক্তহস্ততার কাহিনী প্রায় আরব্যোপন্যাসের মত। কৌতূহলী পাঠক 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' পুস্তকের ব্রাহ্মণকাণ্ডের ৬।৩৩৪—৩৪৯ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। ১৮৩৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে (*Bengal Almanak*, 1847, 'Chronological Event' নামক অংশে এই তারিখ উল্লিখিত আছে) দ্বারকানাথ District charitable Societyতে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন; এই দানের পরিমাণ সে সময়ে সকলকে চমকিত করিয়াছিল। স্বীয় উইলেও তিনি এক লক্ষ টাকা দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ দান করিবার ব্যবস্থা করেন। এই বদান্যতা ব্যতীত তাঁহার পদোচিত সম্ভ্রমরক্ষা করিবার জন্যও তাঁহাকে ব্যয়শীল হইতে হইত। তাঁহার বেলগেছিয়ার ডিনার ভোজের ব্যয় ও বিলাতের ব্যয়ের কথাও সর্ব্বজনবিদিত।

আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

৯ই আশ্বিন, ১৩৩৩ সাল।

গত ৯ই আশ্বিন, ইংরাজী ২৬ শে সেপ্টেম্বর রবিবার প্রাতঃকাল ৯ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ দ্বিতল-গৃহে গত ৩রা আশ্বিনের বিজ্ঞাপন অনুসারে অধ্যক্ষসভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন—

(১) শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক, (২) শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, (৩) শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক, (৪) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (৫) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, (৬) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল এবং (৭) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে (৮) শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্‌সি অধ্যক্ষরূপে পরিগৃহীত হইয়া অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

১। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবনে, পাঁচুগোপাল বাবুর সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্‌সি অধ্যক্ষসভার সভ্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই অধিবেশনে যোগদান করিবার অধিকার লাভ করিলেন।

৩। অধ্যক্ষসভার অন্যতর সভ্য ও আদিসমাজের পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই অধিবেশনে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হওয়ায় দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক এবং সমাজের আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য গভীর সহানুভূতি প্রকাশের সঙ্গে ২৫৲ পঁচিশ টাকা পাঠাইয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পঠিত হইল।

স্থির হইল, তাঁহাকে সভার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্যবাদপত্র প্রেরিত হোক।

৪। সুরেশ বাবুর প্রস্তাবনে, চিন্তামণি বাবুর সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদিব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

৫। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবনে এবং খগেন্দ্র বাবুর সমর্থনে শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

৬। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে আদিসমাজের সভাপতি কে হইতে পারেন, তাঁহার নাম অধ্যক্ষসভার আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবার ভার ক্ষিতীন্দ্র বাবুর উপর প্রদত্ত হইল।

৭। আদিব্রাহ্মসমাজের গৃহসংস্কার বিষয় আলোচিত হইল।

দুই তিন বার এই গৃহ ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখানো হইয়াছে। তাঁহার মতে মেরামত করা বিশেষ আবশ্যক। এ বৎসর হইতে ছাদ ফাটিয়া জল পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। অল্পকাল হইল, গানের বেদীর দক্ষিণ দিকের অংশ পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় ঋণপ্রদান করিয়া প্রায় দুইশত টাকায় উহা মেরামত করাইয়াছিলেন। এখনকার নিতান্ত দরকারী মেরামতগুলিও করিতে গেলে প্রায় তিন চার হাজার টাকা লাগিবে। মহর্ষির ষ্টেট হইতে যে ২০০৲ দুই শত টাকার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা মামুলী খরচের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। মহর্ষির ষ্টেটের চেকদাখিলা ছাপানো প্রভৃতি যে সকল আয়ের পথ ছিল, সে সমস্ত কার্য্য বর্ত্তমানে অন্যত্র হওয়ায় পূর্ব্বের আয়ের পথগুলিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং চাঁদা সংগ্রহ ব্যতীত মেরামত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। এখন বিবেচ্য, কি উপায়ে এই চাঁদা সংগ্রহ হইতে পারে।

সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বদান্য ব্যক্তি প্রভৃতির নিকটে আবেদন এবং অন্যান্য উপায়ে চাঁদা আদায়ের সাধ্যমত চেষ্টা করা হোক।

৮। আদি সমাজের আর্থিক উন্নতিসাধনের উপায় বিষয়ে আলোচনা হইল।

আর্থিক উন্নতি সাধনের বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান উপায় মহর্ষির ষ্টেট হইতে তাঁহার উইল অনুসারে প্রাপ্য মাসিক ২০০৲ টাকার বৃত্তি নিয়মিতরূপে পাওয়া। মহর্ষির উইল অনুসারে তাঁহার ষ্টেটের যে অংশ পূজ্যপাদ ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ, ৺সত্যেন্দ্রনাথ এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন, সেই অংশ হইতেই আদিসমাজে মাসিক ২০০৲ টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। তাঁহার উইলের executor ছিলেন ৺দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষির পরলোকগমনের পর ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ, ৺সত্যেন্দ্রনাথ এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, এই তিন জনের পক্ষ হইতে উহাঁদের তদানীন্তন সাধারণ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতি মাসে টাকা দিয়া রসিদ গ্রহণ করিতেন। কয়েক বৎসর বাদে কিছুকাল যাবৎ ৺সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার পরলোকগমনের পরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্ম্মচারী উপরোক্ত তিন জনের পক্ষ হইতে টাকা দিয়া রসিদ গ্রহণ করিতেন। অবশেষে গত মাঘ মাস অবধি উক্ত বৃত্তি পাওয়া যায় নাই। গত ৩০ চৈত্র সুরেন্দ্র বাবুর সরকার পত্রের দ্বারা জানাইয়াছে যে, গত মাঘ মাস হইতে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্র বাবুর ষ্টেট হইতে) উক্ত বৃত্তি দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে রথীন্দ্র বাবুকে দুই খানি পত্র, তন্মধ্যে একখানি রেজেষ্ট্রী ডাকে লেখা হয়; দুঃখের বিষয় একখানিরও উত্তর পাওয়া যায় নাই। মিউনিসিপাল ট্যাক্সের বিল যাহা আসিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্র বাবুর বর্ত্তমান কর্ম্মচারী উক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া দেওয়াতে তিনি তাহা শোধ করিয়া দিয়াছেন। এখন, উক্ত প্রাপ্য মাসিক বৃত্তি নিয়মিতরূপে পাইবার এবং মাঘ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বাকী পড়া ন্যূনাধিক ২০০০৲ দুই হাজার টাকা অবিলম্বে পাইবার ব্যবস্থা না করিলে সমাজের সকল কার্য্যই বন্ধ করিতে হয়। কারণ সমাজের অন্য আয়ের পথ প্রায় সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমাজের বর্ত্তমান কর্ম্মচারী প্রায় দশ বারো জন। উহাদের বেতন নিয়মিত দিবার কি ব্যবস্থা করা যায়? এতদিন পর্য্যন্ত সম্পাদক মহাশয় ঋণপ্রদান করিয়া কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা সম্ভব নহে।

সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে এবং সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল যে, বৃত্তি বাবতে উপরোক্ত প্রাপ্য যাহাতে অবিলম্বে এবং পরে যাহাতে উক্ত মাসিক বৃত্তি নিয়মিতভাবে মাসে মাসে পাওয়া যায়, তাহার জন্য রথীন্দ্র বাবু প্রভৃতিকে সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত পত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হোক।

৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের উপায় আলোচিত হইল।

বর্ত্তমান বৎসরে পত্রিকা ৮৪ বৎসরে চলিতেছে অনেকে বলেন, পত্রিকার আকার 'প্রবাসী' 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতির আকারে পরিবর্ত্তিত করিলে ভাল হয় এবং ইহাতে বিজ্ঞাপন বেশী পাওয়াও সম্ভব। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, এবিষয় আগামী ফাল্গুন মাসের শেষে আলোচিত হইবে।

১০। যন্ত্রালয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের বিষয় আলোচিত হইল।

ইংরাজী, বাঙ্গালা ও দেবনাগরী অক্ষরাদির জন্য প্রায় দেড় হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে যন্ত্রালয়কে কতকটা self supporting ভাবে চালাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ ক্রমে এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে, এই টাকার জন্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের নিকট আবেদন করা হোক।

১১। সমাজের কোন অংশ ভাড়া দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল।

ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় নিম্নতলের এক অংশ ভাড়া দিবার প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত করেন। অবশেষে নানা কারণে উহা চাপা পড়িয়া যায়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, ট্রষ্টীডের অবিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য নিম্নতলের কোন অংশ ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে, এবং এই ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে যাহা উচিত বিবেচনা করেন, তাহাই করিবার জন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর সম্পূর্ণ ভার দেওয়া গেল।

১২। সাপ্তাহিক ও মাসিক উপাসনার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের উপায় আলোচিত হইল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, মাসিক উপাসনা কোন্ সময়ে হইলে উপাসকগণের সুবিধা হইবে ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার ভার সম্পাদকদ্বয়ের উপর ন্যস্ত হোক।

১৩। গীতারহস্য-বঙ্গানুবাদ মুদ্রণ ও বিক্রয় সম্বন্ধে আলোচনা হইল।

গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আদিসমাজের তদানীন্তন অন্যতর সভাপতি ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, লোকমান্য বালগঙ্গাধরতিলক এবং আদিসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই তিনজনের মধ্যে গীতারহস্য সম্বন্ধে যে চুক্তি স্থির হইয়াছিল, তাহা লোকমান্য তিলকের ১৯১৮।২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ২৩ মার্চ তারিখের দুই পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে ১৯১৮।১০ মার্চ তারিখের সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত পত্রও দ্রষ্টব্য। চুক্তির প্রধান point গুলি নিম্নে লিখিত হইল—

(১) অনুবাদককে ২০০০৲ টাকা দেওয়া হইবে, তাহা হইতে নূতন অক্ষর প্রভৃতি কেনা হইবে।

(২) তিলক মহোদয় কাগজের সমস্ত দাম, ছাপাই বার ব্যয়, printing charges এবং বিজ্ঞাপনের খরচ দিবেন।

চুক্তি অনুসারে সমস্তই পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মোটে ১৬০০ খণ্ডের কাছাকাছি বিক্রয় হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রিত হইয়াছে ৭০০০ খণ্ড। লোকমান্য তিলক তাঁহার পত্রে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সমস্ত খরচ উঠিয়া গিয়া যাহা লাভ দাঁড়াইবে, তিনি তাহার অর্দ্ধেক সমাজে সঙ্গে সঙ্গেই দান করিবেন এবং অপর অর্দ্ধেকও তিনি সমাজে পরে দান করিবেন। সমাজে স্থানাভাবের জন্য মুদ্রিত ফর্ম্মাগুলির কোন অংশ নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সম্পাদক মহাশয় নিজের দায়িত্বে এগুলি সমাজে রাখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, লোকমান্য তিলক-মহোদয়ের পুত্রগণকে ফর্ম্মাগুলি সরাইয়া লইবার জন্য অথবা তাঁহাদের দায়িত্বে অন্য কোথাও রাখিবার জন্য লেখা হউক।

১৪। আদি ব্রাহ্মসমাজে ইলেট্রিক পাখার ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা হইল।

আপাতত ১০খানা পাখা হইলেই চলিবে। আন্দাজ এক হাজার টাকা লাগিবে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, ইহার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হউক।

১৫। প্রেসম্যান শ্রীতিনকড়ি দের সাহায্যের জন্য আবেদন আলোচিত হইল।

তিনকড়ি ৪২।৪৩ বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে যন্ত্রালয়ের কার্য্য করিতেছে। তাহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঋণের জন্য কিছু সাহায্য চায়। স্থির হইল, সমাজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় উহাকে সমাজ হইতে কোন সাহায্য দেওয়া সম্ভব হইবে না। উপস্থিত অধ্যক্ষগণ নিজেদের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উহাকে ২১৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন—চিন্তামণি বাবু ১০৲, ক্ষিতীন্দ্র বাবু ৫৲, পাঁচুগোপাল বাবু ১৲, সিতিকণ্ঠ বাবু ১৲, খগেন্দ্র বাবু ১৲, নির্ম্মলবাবু ১৲, সুরেশ বাবু ১৲ এবং ক্ষেমেন্দ্র বাবু ১৲।

১৬। গত মাঘোৎসব উপলক্ষে আদিসমাজের মেরামত বাবতে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত ১১৩।৶৬ পাইয়ের বিল আলোচিত হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, ইহা পরিশোধ করা হউক।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীসিতিকণ্ঠ মল্লিক
সম্পাদক।	সভাপতি।
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৩।	২৮শে কার্ত্তিক ১৩৩৩।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

গ্রন্থপরিচয়।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এস্-সি)

আর্থিক উন্নতি।—মাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার। প্রাপ্তিস্থান—১০৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা এই নবপ্রকাশিত সহযোগীকে বাংলার

মাসিকে এক নূতন পথপ্রবর্ত্তন করায় সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। উপন্যাস বা গল্প না দিয়াও যে অধ্যাপক সম্পাদক মহাশয় বাংলাদেশে এক নূতন ধরণের মাসিক চালাইতে চাহিতেছেন, ইহা তাঁহার দুঃসাহস বলিয়াই অনেকে মনে করেন। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার এই "দুঃসাহস" অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। বিনয়কুমার বাঙ্গালীর চক্ষু নিজের ঘরের ধনভাণ্ডারের দিকে ফিরাইয়া বাংলার যে উপকার করিতেছেন তাহা দেশ সহজে ভুলিবে না। আমরা এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

Sanskrit Collegiate School Magazine :—সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রকাশিত এই ষান্মাসিক পত্রিকাটি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এই ছাত্রবর্গের সকলেই সম্ভবতঃ ষোড়শ বা সপ্তদশ বর্ষের নিম্নে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা যেরূপ নিপুণভাবে এই পত্রিকা পরিচালন করিতেছে, তাহাতে তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমরাও বহু বৎসর ঐ বিদ্যালয়ে পড়িয়াছি। আজ কয়েক বৎসর বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও স্নেহবন্ধন ছিন্ন হয় নাই। আমরা আশা করি, উত্তরোত্তর ইহার শ্রী অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

নীলাচল—শ্রীচুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্ প্রণীত এবং শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু এম্ বি, এফ্ সি এস্ কর্ত্তৃক ২৫নং মহেন্দ্র বসুর লেন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; মূল্য ১৲ এক টাকা।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে পুরী এবং আনুষঙ্গিকরূপে পুরীর নিকটবর্ত্তী দুই চারিটি স্থানের বিশেষতঃ পুরীর জগন্নাথমন্দিরে জগন্নাথের যে সকল উৎসবাদি হয় তাহা সুন্দরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে রঘুনন্দনবিরচিত 'শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্ব' সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটী আরও উপাদেয় হইয়াছে। কেবল একটী বিষয়ে আমরা রসায়নাচার্য্য মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, বিবরণটী ১৯০৩ সালে লিখিত, সুতরাং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অবস্থার সহিত নাও মিলিতে পারে। টীকা টিপ্পনী দ্বারা গ্রন্থটী বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

সমাজরেণু।—শ্রীমহেন্দ্রনাথ কর প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনিরঞ্জন বিজলী, গোকুলনগর গ্রাম, মেদিনীপুর। মূল্য আট আনা।

এই গ্রন্থটী কতকগুলি সুন্দর সামাজিক কবিতার সমষ্টি। ইহা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভেরী বলিলেও চলে। গ্রন্থকার সুস্পষ্টরূপে অস্পৃশ্যতার অস্বাভাবিক মূর্ত্তি হিন্দুসমাজের সম্মুখে ধরিয়াছেন। তবে ইহাতেও কি হিন্দুসমাজ জাগিবে? দুই একটি ভিন্ন সকল কবিতাই এত সুন্দর যে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

আর্য্যসমাজ কাহাকে বলে?—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

গ্রন্থটী পাঠ করিলে আর্য্যসমাজের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বেশ একটু ধারণা জন্মে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনবৃত্তান্তটি স্বল্প কথায় লিপিবদ্ধ হইলেও রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। আর্য্যসমাজের মতের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মত দুই একটী ভিন্ন অনেক অংশেই মিলিয়া যায়। এক সময়ে আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের পরস্পর মিলনের পর্য্যন্ত কথা উঠিয়াছিল—মতে এত মিল আছে। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভাল।

The Universal Religion (Part I)।—শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত। মূল্য দুই টাকা মাত্র। ৩২নং সরকার লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থটী ইংরাজীতে লিখিত। গ্রন্থকার আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া সকল ধর্ম্মের এবং সমাজের সামঞ্জস্য করিতে চাহিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্যম এবং দৃষ্টির উদারতা প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি তাঁহার এই চেষ্টা সাফল্যলাভ করুক। এই উদ্দেশ্য লইয়াই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম।

ভগবদ্গীতিমালা।—ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত-সংগ্রহ। সংগ্রাহক রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর এম্-এ, বি-এল। প্রকাশক—শ্রীললিতমোহন ঘোষ। ২৩।১।৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

গ্রন্থটী অনেকগুলি সঙ্গীতের সংগ্রহ। সংগ্রহটী সুনিপুণ হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে সূচীপত্রে বিষয়নির্দ্দেশ। এইখানেই সংগ্রাহকের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

New English Reader Book IV,
New English Translation Book I.
New English Translation Primer

Published by Charu Chandra Guha, Patuatuly, Dacca. এবং 57/1, Raja Dinendra Street, Calcutta.

পুস্তকগুলি বিদ্যালয়ের উপযোগী করিয়া লিখিত। যে সকল বিষয় নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা বালকগণের পক্ষে সুবোধ্য হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শোক-সংবাদ।

৺নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়।—বিগত ১১ই আশ্বিন বুধবার বেহালাব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রায়

সাহেব শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভবানীপুরের অভয় সরকার লেনস্থ বাসবাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দান করুন, এবং তাঁহার শোকার্ত্ত পুত্রগণের অন্তরে সান্ত্বনা বারি বর্ষণ করুন।

ডাক্তার ৺ডি. এন. রায়।—স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার ডি. এন. রায় বিগত ২১ শে আশ্বিন শুক্রবার তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে চিকিৎসকমহলে বিশেষ যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি মহর্ষিদেবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। মহর্ষিদেবের শেষজীবনে সামান্য অসুখের সংবাদ পাইলেই তখনই তিনি ছুটিয়া আসিতেন। ইনি শ্রদ্ধেয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। আমরা ইহাঁর শোকার্ত্ত পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁর লোকান্তরিত আত্মার সুগতি বিধান করুন।

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।—স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত ১৮ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার মেদিনীপুরস্থ স্বীয় পল্লীভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মগণের মধ্যে একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। ইহাঁরই উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হইয়াছিল। ইনি আমৃত্যু ব্রাহ্মসমাজের সেবাকেই স্বীয় জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথও চিরদিন ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী ছিলেন, এবং কিছুকাল আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষরূপে ইহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইদানীং পল্লীভবনেই বাস করিতেন। তিনি যে এত শীঘ্র আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি নাই। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত। তদীয় পুত্র পরিজনদিগের এই গভীর শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি; ভগবান ইহাঁর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন।

সংবাদ।

জন্মতিথি উৎসব—গত ৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার প্রাতঃকাল ৭॥ ঘটিকায় ৯।এ সাউথ রোড ইটালীতে আমাদের পরম সুহৃদ্ প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের দৌহিত্র, শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ বাদবানন্দের জন্মতিথি-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যথারীতি উপাসনা ও উপদেশাদি আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়াছিলেন। ভগবান বালককে মঙ্গল ও উন্নতির পথে অগ্রসর করুন।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব—গত ৩০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। প্রাতঃকালীন উপাসনা ৭॥ ঘটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল। উপাসকসংখ্যা অধিক না হইলেও প্রভাত ও পল্লীর স্বাভাবিক স্নিগ্ধতায় সমগ্র উপাসনাটী বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অপরাহ্ণ বেলা ৩ঘটিকার সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের 'পারায়ণ' হইল। উৎসবের এই অঙ্গটী বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একান্ত নিজস্ব ও অভিনব; ইহার অন্যত্র প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

শীতের শান্ত সায়াহ্ণ যখন ছায়ানিবিড় হইয়া পল্লীর বুকে নামিয়া আসিল, তখন হইতেই সায়ং উপাসনায় যোগ দিবার জন্য লোকসমাগম আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজ ও চিন্তামণিবাবুর সুবিস্তীর্ণ গৃহপ্রাঙ্গণ সকল সমাজ ও সম্প্রদায়ের উপাসকমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া গেল। সন্ধ্যাদীপের মঙ্গলালোকে সমাজগৃহটী এক অপূর্ব্ব শান্ত কোমল শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাঙ্গণদ্বারে নহবৎ বসিয়াছে। প্রবেশপথ হইতে সোপানাবলী পর্য্যন্ত পত্ররচিত স্তম্ভের উপর বেলোয়ারী ঝাড় দুলিতেছে। সর্ব্বত্র লতায় পাতায় স্নিগ্ধ দীপালোককে ও ধূপধুনার পবিত্র গন্ধে বেশ একটী অভিনব উৎসবের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। যথারীতি উপাসনাদি হইয়া গেল। সঙ্গীতের অংশ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। উপাসনান্তে সমাগত জনগণের জলযোগের সবিশেষ ব্যবস্থা করিয়া চিন্তামণি বাবু উৎসবের প্রচলিত পুরাতন অঙ্গটী যথারীতি বজায় রাখিয়াছিলেন। চিন্তামণিবাবু ও তাঁহার পুত্রগণের আতিথেয়তা সবিশেষ প্রশংসনীয়। বেহালায় এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব শ্রদ্ধাস্পদ বেচারাম বাবুকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, কালে বেহালার এই ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মসমাজের 'কালীঘাট' হইয়া দাঁড়াইবে। আজ এইখানে সর্ব্ব সমাজ ও সম্প্রদায়ের মিলন দেখিয়া আমাদের অন্তরে বার বার কেবল সেই মহাপুরুষের অমোঘ বাণীই জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল।

হিতৈষণা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অভিমত।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ) —শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত, ৫৫নং আপার চিৎপুর রোডস্থ আদিব্রাহ্ম-সমাজ-যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

নামেই পুস্তকের গৌরবের বিষয় সূচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থনিবদ্ধ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশগুলি নানা গভীর দার্শনিক তত্ত্বকথায় পূর্ণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ হয় তো অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, মহর্ষি পার্থিব সংসারে থাকিয়াও সমস্ত সংসারকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। পাঠক! মহর্ষির শ্রীমুখ নিঃসৃত তত্ত্বোপদেশ পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া লউন। জন্মভূমি—১৩১১ শাল, ভাদ্র।

আর্ট ও সাহিত্য—বঙ্গ-সাহিত্যের বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত। তাই, বঙ্গ-সাহিত্যে এখন নিত্যই দুর্গন্ধ আবর্জ্জনারই আতিশয্য ঘটিতেছে। রাশি রাশি অশ্লীল এবং রাবিশ রচনার ফলে বঙ্গ-সাহিত্য অমেধ্য এবং ক্লেদবহুল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গবাণী ক্রমেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছেন।

"বঙ্গদর্শনে"র আমলে বঙ্গ-সাহিত্যের রাবিশ জঞ্জাল পরিষ্কারের উত্তম ব্যবস্থা ছিল। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক বঙ্কিম বাবুর সমালোচনা-সম্মার্জ্জনীর আঘাতে অনেক বিকৃতমনা লেখককেই প্রকৃতিস্থ হইতে হইত। ইদানীং আবার সেরূপ সম্মার্জ্জনই বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

সুখের বিষয়, কিছুদিন পূর্ব্বে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় তাঁহার "সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা" নামক পুস্তকে সেইরূপ সম্মার্জ্জন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; আবার সম্প্রতি সুধী লেখক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ মহাশয়ও সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ইনি "আর্ট ও সাহিত্য" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

"আর্টের" খাতিরেই অনেক লেখক কিরূপ জঘন্য চিত্র আঁকিয়া আজকাল সাহিত্য-সেবার স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, ফলে বঙ্গসাহিত্যের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটাইতেছেন, ঠাকুরমহাশয় "আর্ট ও সাহিত্য" পুস্তকে তাহাই দেখাইয়াছেন। "আর্ট ও সত্য", "আর্ট ও মঙ্গল" "আর্ট ও সৌন্দর্য্য" "আর্ট ও সাহিত্য" "আর্টের খাতিরে আর্ট" প্রভৃতি কয়েকটী অধ্যায়ে গ্রন্থকার মহাশয় "আর্টের" বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন বিশ্লেষণ ভালরূপই করিয়াছেন। "আর্টের" দাবীতে যে সকল লেখক নির্লজ্জভাবে কামিনীর নগ্নরূপ দেখাইতেই ভালবাসেন বা দেশের কল্যাণকর বলিয়া বুঝেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের এই সকল অধ্যায়ে আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। যাঁহারা তাহা না পারিবেন, তাঁহারা অতি দুর্ভাগ্য বলিয়াই আমরা বুঝিব। তাঁহাদের কলম ধরা একবারে বন্ধ করাই উচিত। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া পাঠক-পাঠিকার কাম-বিলাস-কামনা যাঁহারা বাড়াইয়া দিতে চাহেন,—তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের এবং বঙ্গদেশের ঘোরতর শত্রু। ধিক্ তাঁহাদের রচনায়,—ধিক্ তাঁহাদের অর্থলোভে! শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকের লেখায় গুরুতর কুফল যেমন সূক্ষ্ম সমালোচনায় সহিত দেখাইয়াছেন,—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনি যথেষ্ট শিষ্ট এবং বিনম্র ভাবেরও পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় লেখক-শার্দ্দূলগণের পুস্তকের আলোচনা করিতে—তাঁহাদের লেখার দোষ গুণ ধরিতেও সঙ্কুচিত হন নাই; বেশ নির্ভীক ভাবেই তিনি ইঁহাদের পুস্তকের আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকের অনেক ভাবই যে বিদেশী পুস্তক হইতে সংগৃহীত—তাহাও গ্রন্থকার নির্ভীক ভাবেই দেখাইয়াছেন, এবং কোন কোন স্থলে সে সন্দেহও যুক্তিসঙ্গত রূপেই করিয়াছেন। "চন্দ্রশেখরে"র প্রতাপ-শৈবলিনীর সন্তরণ-দৃশ্য বা "সীতারামের" শ্রীর বৃক্ষশাখায় দণ্ডায়মান অবস্থায় সমরদর্শন—প্রভৃতি দৃশ্যের মূল ছায়া আমরাও স্কটের উপন্যাসবিশেষে পড়িয়াছি। তবে বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য প্রতিভা বলে এই সব দৃশ্য রূপান্তরে আঁকিয়াছেন। যাই হউক, শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার সকল মন্তব্যে এবং সমালোচনার সর্ব্বাংশে আমাদের মতসাম্য না থাকিলেও মুক্তকণ্ঠে বলিব, তাঁহার সাহিত্য সমালোচনাসম্বলিত এই প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল শ্রেণীর পাঠকেরই মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করা উচিত; পাঠ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কদাদর্শমূলক পুস্তক এবং পুস্তক লেখকগণ হইতে দৃঢ়সংকল্পে সাবধান হওয়া উচিত। যাঁহারা কেবলমাত্র কুচিত্র আঁকিয়া বঙ্গ-ভারতীর অঙ্গ নিত্য কলুষিত করিতেছেন, তাঁহারাও সাবধান হউন।

এই পুস্তকের আর এক শোভন অঙ্গ—ইহার ভূমিকা। অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন—এবং মাইকেল মধুসূদনের কাব্যাবলীর অভিনব সংস্করণ সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী এবং সমালোচক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল বি-এ, এম-বি এই ভূমিকা লিখিয়াছেন। তিনি অল্পের ভিতর ইহাতে বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এমন কয়েকটী সারগর্ভ কথা লিখিয়াছেন—যাহা বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য এবং সুপাঠ্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

"প্রাচীন বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্য ছিল না;—ছিল কেবল কাব্যাকারে ধর্ম্মসাহিত্য। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হইল এবং বঙ্গসাহিত্যে গদ্যকাব্য (উপন্যাস) দেখা দিল। "আলালের ঘরে দুলাল" বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস হইলেও এখন যে ভাষায় যে ভাবে, যে ধরণে, যে উপকরণে এবং যে আদর্শে অধিকাংশ উপন্যাসরাজি রচিত হইতেছে, তাহার জন্মদাতা নব্যবঙ্গের সাহিত্যিকচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিলাতী প্রভাবে প্রভাবিত। সুতরাং তিনি তাঁহার উপন্যাসের আদর্শ লইলেন পাশ্চাত্য দেশ হইতে। উপন্যাসের প্রধান উপাদানবস্তু নবনারীর প্রেম। তাই দেখিতে পাই, পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য উদ্দাম প্রেম-লীলাও বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যে নানা ভাবে, নানা ছাঁদে প্রকটিত হইতে আরম্ভ করিল। সুদক্ষ শিল্পীর হাতে দেশী ছাঁচে ঢালা হইলেও, তাহার বিদেশী ভাব বিদেশী ছন্দ, বিদেশী গন্ধ এবং সর্ব্বোপরি প্রবৃত্তিমূলক প্রেমের তীব্র মাদকতা, মনোজ্ঞ ভাষায় ও মনোহর বর্ণনায় মণ্ডিত হইয়া বঙ্গের পাঠক-পাঠিকাদিগের মস্তিষ্কে বেশ

একটু গোলাপীগোছের উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। প্রাচীন ভারতের সেই নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম, নিবৃত্তিমূলক সমাজ, নিবৃত্তিমূলক আচার-অনুষ্ঠান বহুকালের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনায় শ্রীভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট ও জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া, লক্ষ্যের সন্ধান করিয়া সংস্কার করিলে এবং আবর্জ্জনা বর্জ্জন করিয়া, তাহার স্থলে সত্য, জ্ঞান ও নিবৃত্তির আবাদ করিলে হয়তো সোনা ফলিতে পারিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশে তাহা হয় নাই। যাঁহারা ইংরাজিতে সুপণ্ডিত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই মুখ ফিরাইলেন পাশ্চাত্যের দিকে। তাঁহারা সকল বিষয়েই আদর্শ লইতে লাগিলেন বিলাতী। এমত স্থলে একা সাহিত্যই বা বাদ পড়িবে কেন? উপন্যাসও বিলাতী আদর্শে রচিত হইতে লাগিল এবং রোচক বলিয়া প্রবৃত্তির মুখে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ গোগ্রাসে তাহা গ্রহণ ও গলাধঃকরণ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতে লাগিল।

"উপন্যাসের ঐ ধারা, যাহা বঙ্কিমচন্দ্র ধরাইয়া গেলেন এখন সেই ধারাই শতধারায়, সহস্রধারায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে। আজকাল এই যে, বঙ্গের কুলকন্যা ও কুলবধূগণ দেবসেবা, গৃহসেবা, শিশুসেবা, সমাজসেবা ইত্যাদি শতবিধ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা করিয়া, কামকলার নিত্যনূতন উপন্যাস-পাঠও তাঁহাদের নিত্যনূতন বিলাসকলার অঙ্গীভূত করিয়া লইলেন; এই যে স্কুল কলেজের সুকুমারমতি ছেলেরা ঐ অপূর্ব্ব সাহিত্যের বিচিত্র প্রেমলীলার ঝাঁঝালো আদিরস ভরপুর হইয়া যৌবনকে যেন ডাকিয়া আনিতে চাহিতেছে;—আর এই যে ত্রিতাপক্লিষ্ট কেরাণীকুল ঐ সাহিত্যের নেশায় তাঁহাদের অবসন্ন মনকে কথঞ্চিৎ উত্তেজিত করিবার জন্য নব নব উপন্যাসকে তাঁহাদের অবসর-সহচর করিয়া তুলিতেছেন;—ইহা যে মঙ্গলজনক নহে, ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যেও এইরূপ একটা লোকমত ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই।"

"কাব্যকলায় আদিরস" সম্বন্ধে সূক্ষ্মদর্শী সাম্যাল মহাশয় বলিতেছেন,—

"কাব্যকলায় আদিরস পরম উপাদেয় ও উপভোগ্য বলিয়া পরিগণিত; রস-শাস্ত্র উহাকে "বিষ্ণুদৈবত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতেই ঐ রসের পবিত্রতা সূচিত। ঐ রসের নামান্তর "উজ্জ্বল রস"—ইহাতেই উহার উপভোগ্যত্ব সুব্যক্ত। উত্তম-প্রকৃতি নায়ক নায়িকা অবলম্বনে ঐ রসের পরিস্ফুটন করাই বিধি এবং তাহাই শোভন। বঙ্গের একজন সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক, পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রণীত কাব্যদর্পণের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"আদ্যরসের উল্লেখ করিতে হইলেই যে লেখনী ঘৃণাকর ও লজ্জাজনক বিষয়সকল উদ্গীর্ণ করিবে, ইহা কেবল ভ্রান্তিবিলসিত। যেরূপ ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু ঋতুরাজ বলিয়া আদরণীয়, নবরসের মধ্যে নিরাবিল আদ্যরসও সেইরূপ আদরণীয়।" কিন্তু বাঙ্গালার অধিকাংশ উপন্যাসেই এ আদর্শ রক্ষিত হয় নাই, হইতেছেও না। 'আর্ট'-বাদীরা কি বলিতে চাহেন যে, নিরাবিল ও পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে কাব্য-শ্রী নাই বা হইতে পারে না? যত কাব্য-শ্রী ফুটিয়া উঠে কেবল গণিকা, ক্ষণিকা, পরকীয়া ও নরকীয়া প্রভৃতির প্রেমে? তাঁহারা কি জানেন না বা মানেন না যে, সামাজিক ধর্ম্ম প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সতীত্বধর্ম্ম বা দাম্পত্যপ্রেমই সকল প্রকার প্রেমের মূলাধার। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি প্রথমে গৃহে অঙ্কুরিত হয়; এবং ক্রমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ব সমাজ ও স্ব-দেশ আলিঙ্গন করিয়া, অবশেষে জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। এই দাম্পত্যপ্রেমের উৎকর্ষেই সন্তানের উৎকর্ষ, গৃহের উৎকর্ষ; সুতরাং সমাজের উৎকর্ষের মূলও উহাই। এই প্রেম নষ্ট কর দেখিবে, গৃহ থাকিবে না,—সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। গৃহ না থাকিলে, সমাজ কোথায় থাকে? কোন্ ইতিহাসাতীত যুগে, যে দিন মানুষ গৃহ বাঁধিয়া তাহাতে গৃহিণী-স্থাপনা করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া মানব-হৃদয়ের এই প্রেম বীজ অঙ্কুরিত হয়। তার পর, যুগ যুগান্তরের লালন পালনে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধিত হইয়া এবং শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া, নানা ভাবে নানা আকারে উহা এখন সমাজ-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহ বল, ভক্তি বল, প্রীতি বল, মৈত্রী বল, সহৃদয়তা বল,—সকল সামাজিক ধর্ম্মের মূলই ঐ। গৃহে ইহার জন্ম, সমাজে ইহার ব্যাপ্তি, এবং পরিশেষে পরম প্রেমময়ের পাদমূলে ইহার পরিসমাপ্তি। যে বিশ্বপ্রেম প্রেমিকের চরম আদর্শ, গার্হস্থ্য ধর্ম্মেই তাহার দীক্ষা, সমাজধর্ম্মেই তাহার সাধনা এবং দেবত্বলাভেই তাহার স্থিতি। এই দাম্পত্যপ্রেমই মাতৃত্বকে মহিমামণ্ডিত করিয়া অতি দীনহীনের গৃহকেও স্বর্গতুল্য করিয়া থাকে। আর্ট-বাদীরা কি বলিতে চাহেন, এ হেন প্রেমে কাব্য-শ্রী নাই? কত সহস্র সহস্র বৎসর-ব্যাপী বিবর্ত্তে নরনারী সম্বন্ধে যে একনিষ্ঠতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকল সভ্য-সমাজেই সুমহান অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছে, সেই একনিষ্ঠায় মঙ্গলের সহিত সৌন্দর্য্য না থাকিলে, তাহা কি কখনও মনুষ্যসমাজে আদরণীয় ও প্রশংসনীয় হইতে পারিত? প্রবৃত্তিমুখী হইয়া দেখিলে, হয়ত উহাতে তত সৌন্দর্য্য না থাকিতে পারে; কিন্তু নিবৃত্তি ও মঙ্গলমুখী হইয়া দেখিলে, উহাতে পরম মহিমামণ্ডিত সৌন্দর্য্য বিরাজমান, দেখা যায়।"

নবীন, অপরিণতবুদ্ধি এবং অদূরদর্শী লেখকগণের এই কয়েকটী উপদেশ-গর্ভ কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য।

ফল কথা, শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের পুস্তক—"আর্ট ও সাহিত্য" নানা প্রকার কারণেই বহুজনপাঠ্য। কুসাহিত্যের পরিমার্জ্জন কল্পে এইরূপ পুস্তকের ইদানীং যত অধিক আবির্ভাব এবং আদর হইবে, ততই মঙ্গল। উত্তম ছাপা; উত্তম বাঁধাই। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান,—৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, আদিব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়; কলিকাতা।

হিতবাদী—৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০।

বিজ্ঞাপন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

১০০০ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭৮ অঞ্জলি—ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবতা।

১। তুমি ভূলোক ও দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার শক্তির তুলনা কোথাও নাই। তুমি ভয়ানকেরও ভয়ানক। তোমারই বলে বলীয়ান হইয়া আমরা সহজেই শত্রুদিগের পরাজয় সাধন করি। ঘরপোড়া বৃষ যেমন রক্তবর্ণ সূর্য্যের রশ্মি দেখিলেও ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়ে, পাপদগ্ধ ব্যক্তিরাও সেইরূপ তোমার বজ্রের জ্যোতি দেখিলেই ভয়াকুল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়।

২। অন্তরীক্ষ তোমা দ্বারাই পরিপূর্ণ হইয়া আছে। তোমারই ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, তোমারই ভয়ে বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং তোমারই ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে। তোমার মহদ্ যশ ত্রিভুবনে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে।

৩। তুমি সকল দেবতার পরম দেবতা। তুমিই সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রসমূহকে স্বস্ব কক্ষে যথানিয়মে পরিচালিত করিতেছ। তুমিই সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। আমাদের সকল অনুষ্ঠানেই যেন তোমাকেই সর্ব্বপ্রথম আসন প্রদান করি।

৪। হিমালয়ের কন্দরে যুগে যুগে ঋষি-মুনিরা তোমারই স্তুতিগান করিয়া আসিয়াছেন। তুমিই সকলের মধ্যে বীর্য্যরূপে অবস্থিতি করিতেছ। আমরা তোমার আদেশে কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই যজ্ঞ সমাপন করিবার উপযুক্ত ধন আমাদিগকে প্রদান কর এবং আমাদিগকে সফলকাম কর।

৫। তুমি অপাপবিদ্ধ। তোমার পবিত্র স্পর্শে সকলই পরিশুদ্ধ হইয়া যায়। তোমার আদেশে আমরা ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছি। যাহাতে অধর্ম্মকে দগ্ধ করিতে পারি, সেইজন্য তুমি আমাদিগকে তোমার বজ্র নিক্ষেপ করিবার মন্ত্র শিক্ষা দাও। আমাদের মন্ত্রশক্তি শত্রুগণের প্রত্যক্ষ হইলে তাহারা আমাদের পদানত হইবে।

৬। হে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব! তুমি শোভন-কর্ম্মা। তুমি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, যাহাতে আমরা তোমারই মত শুভ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই এবং অন্যায় ও অধর্ম্মের বিনাশ সাধন করিয়া জগতের মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে পারি। তুমি আমাদের অন্তরে জ্ঞান প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা প্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া তাহাকে জগতের হিতের জন্য প্রয়োগ করিতে পারি, এবং আত্মাতে প্রজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া তোমার সহিত নিত্য যোগযুক্ত থাকিতে পারি।

৭। হে ঐশ্বর্য্যবান পরমেশ্বর! আমাদিগকে প্রভূত ধনৈশ্বর্য্য প্রদান কর এবং অন্তরে দান

করিবার ইচ্ছা প্রদান কর, যাহাতে আমাদের বংশে বংশপরম্পরায় দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তুমি আমাদের প্রাণের সকল আশা সকল ভরসা শ্রবণ কর। আমরা জানিয়া শুনিয়া যাহা কিছু পাপ করিয়াছি তাহা হরণ কর; না জানিয়া যে সকল অজ্ঞানকৃত পাপ করিয়াছি, তাহাও তুমি হরণ কর। আমাদিগকে সকল বিষয়ে সংযম সাধন শিক্ষা দাও। আমাদিগকে অহিংসা, সত্য প্রভৃতি তোমার অমোঘ অস্ত্র দ্বারা রিপুগণকে পরাস্ত করিবার উপায় শিক্ষা দাও।

৮। তুমি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তোমার যশ কেহই হরণ করিতে পারে না। তোমার বল ও শক্তি অপ্রতিহত। তোমার স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের কার্য্য দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। তুমিই কর্ম্মযজ্ঞের প্রবর্ত্তক, তুমিই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

৭৯ অঞ্জলি—মহেশ্বর দেবতা।

১। প্রিয়জন যেমন প্রিয়জনের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া যায়, সেইরূপ হে প্রেমস্বরূপ! তুমি আমাদের আহ্বান শুনিবামাত্র আমাদের প্রীতি-অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য এখানে আসিয়াছ। তুমি মহৎ হইতেও মহত্তর। তোমারই শাসনে প্রকৃতির সকল কার্য্যই সংঘটিত হইতেছে। হে জ্যোতির্ম্ময়! তোমারই জ্ঞানজ্যোতি লাভ করিয়া আমরা দেবত্বের অভিমুখে চলিয়াছি।

২। দিকে দিকে নরনারীগণ তোমারই স্তুতিগান করিতেছে এবং তোমারই অন্বেষণে আকুলচিত্তে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তুমি আমাদের পালক ও সংসারযজ্ঞের প্রবর্ত্তক। হে চিরন্তন সখা! তুমি আমাদিগকে বল দাও, বীর্য্য দাও, যাহাতে আমরা তোমার প্রবর্ত্তিত সংসারযজ্ঞে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইন্ধন যোগাইতে পারি।

৩। তুমি মন হইতেও বেগবান পরম পুরুষ। আমরা ক্ষুদ্র কীট, তুমি অনাদি মহান। তুমি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। তোমার প্রতি যাহারা অশ্রদ্ধাবান, তাহাদের নিকটে তুমি রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও। সংশয়াত্মাদিগের অন্তরের লৌহকবাট ভাঙ্গিয়া তুমি তোমার জ্ঞানে প্রেমে তাহা পূর্ণ কর।

৪। সূর্য্য যেরূপ ঊষাকে জাগাইয়া তুলে, দীপ্ত সূর্য্য তুমিও সেইরূপ আমাদিগের অন্তরে জাগরণ আনয়ন কর, এবং রিপুগণের হস্ত হইতে রক্ষার উপায়স্বরূপে আমাদিগকে শতবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত কর। তোমার জ্যোতির সম্মুখে হৃদয়ের অন্ধকার দূরে পলায়ন করে। তোমার বজ্রাগ্নি দ্বারা আমাদের সকল পাপ সকল তাপ ভস্মীভূত হইয়া যাক্।

৫। হে রক্ষকের রক্ষক! সকল ভয়ের মধ্যে, সকল বিপদের মধ্যে তোমারই প্রেম বর্ম্মরূপে আমাদিগের প্রাণে সংলগ্ন থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছে। তুমি আমাদিগের একমাত্র দুর্গ। তুমি আমাদিগকে তোমার অভয়ক্রোড়ে রক্ষা কর এবং শত্রুগণের হিংসা ও আক্রমণ পরাহত কর। তোমার প্রেমধারায় আমাদিগকে অভিষিক্ত কর।

৬। তুমি মহেশ্বর। তুমি পুরুষ মহান। তোমারই শাসনে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে। তোমারই শাসনে অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে নির্ঝরিণী নিঃসৃত হইয়া ধরণীকে শস্যশ্যামল করিতেছে। তোমারই প্রেমের সুকোমল ধারা আমাদের কঠোর পাষাণ হৃদয়ও নিত্যই বিগলিত করিতেছে।

৮০ অঞ্জলি—শক্তিসাগর দেবতা।

১। আমরা যাহা কিছু সুখ সম্পদ সম্ভোগ করিতেছি, এ সকলই তোমারই দান। তুমি মহান। এই প্রকৃতি তোমারই অতুল ঐশ্বর্য্য তোমারই অমোঘ শক্তি ব্যক্ত করিতেছে। এই আকাশও তোমাকে পূর্ণরূপে ধারণ করিতে পারে না। আমরা তোমাকে ভজনা করি।

২। নদীর বন্যার মত তোমার শক্তি যখন আমাদের অন্তরে নামিয়া আসে, তখন যাহারা সেই শক্তি ধারণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকে, তাহারাই উহা নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া নিজেদের আত্মাকে জ্ঞানে ধর্ম্মে ও প্রীতিতে সমুন্নত করিয়া তোলে। ভক্তগণই জানে যে, তুমি, তাহাদের অন্তরে কিপ্রকার আশ্চর্য্য বল বিধান কর।

৩। হে পরম ঈশ্বর! এই ব্রহ্মচক্রে তোমারই উদ্দেশে দিবানিশি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। আলস্যবশত যে সকল দুর্মতি কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত

থাকে, তাহারা তোমারই মঙ্গল বিধানে লয়প্রাপ্ত হয়। আমাদের পরিবারে কেহ যেন কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত না হয়। আমরা সকলেই যেন কৃতী হই এবং আমাদের বংশে কেহই যেন অন্নসংস্থানে বঞ্চিত না হয়। জগতসংসার তোমাতেই বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তুমি এক হইয়াও শত-সহস্র নামে জগতের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছ। তোমারই জ্যোতি আমাদের অন্তরে জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রেমের আকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে।

৪। হে মহেশ! তোমার ঐশ্বর্য্যের সীমা কে নির্দ্দেশ করিবে? তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়। আমরা তোমারই সন্তান। তোমার স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইয়া অজ্ঞান প্রযুক্ত যদি আমরা কোনরূপে তোমাকে ছোট করি, তবে তুমি আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা করিও। তুমি আমাদের পিতামাতা; তুমি আমাদের সখা-সুহৃৎ। আমরা একমাত্র তোমারই চরণে হৃদয়ের প্রীতিভক্তি নিবেদন করিতেছি, তুমি তাহা জননীর স্নেহহস্তে গ্রহণ কর।

৫। হে বিষ্ণু! তোমার তেজ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডচক্র ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। তুমি আমাদের পিতা-মাতা। আমরা তোমারই সন্তান। তুমি আমাদের শুভ ইচ্ছাসকল সফল কর। সুবিশাল এই আকাশও তোমার সমগ্র তেজ ধারণ করিতে পারে না। এই ধরিত্রীও তোমার সমগ্র বীর্য্য ধারণে অক্ষম। অনন্ত উন্নতিশীল এই মানবাত্মাও তোমাকে ধারণা করিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং তোমার চরণে মস্তক অবনত করে।

৬। হে রুদ্র! অশ্রদ্ধাবান ও সংশয়াত্মা-দিগের হৃদয়ের লৌহকবাট একমাত্র তোমারই বজ্র বিদীর্ণ করিতে পারে। সেই লৌহকবাট বিদীর্ণ হইলে তোমার প্রেম উচ্ছ্বসিত নদীর বন্যার মত ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের হৃদয় ডুবাইয়া দিয়া শ্যামল করিয়া দেয়। তোমাকে আমরা নমস্কার করি।

আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০০। পঞ্চব্রাহ্মণ কোথায় আসেন?

পঞ্চব্রাহ্মণ কোথায় আসিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা কিছু তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা কৌতূহল-প্রদ বলিয়া এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে—রাজা আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে পূর্ব্বাবধি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়াছিলেন (১)। এই নির্দ্দিষ্ট স্থান যে কোথায়, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ভুলরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, আদিশূর তাঁহার গৌড় রাজ্যের ভিতরেই কোন স্থান তাঁহাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে আছে—পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে "গঙ্গাবিধৌত মনোজ্ঞ গৌড়ে গমন করেন" (২)। বচনটীর মূল পড়িলেই বুঝা যায় যে, কারিকাকার এখানে গৌড় নগরের পরিবর্ত্তে গৌড় রাজ্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রুতি এই যে, রামপাল নগরীতেই পঞ্চব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম আসিয়া বিশ্রাম করেন (৩)। "রামপাল নগরী একসময়ে বুড়ীগঙ্গার নিকটবর্ত্তী ছিল। এখন যেমন বড়গঙ্গা গৌড় হইতে সুদূরে রাজমহলের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত, পদ্মা ও বুড়ী-গঙ্গাও তদ্রূপ কালমাহাত্ম্যে রামপাল হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে রামপাল নিশ্চয়ই পদ্মা (বড়গঙ্গা) বা বুড়ীগঙ্গার তীরবর্ত্তী ছিল" (৪) সম্বন্ধনির্ণয়কারেরও মতে পঞ্চব্রাহ্মণ বিক্রমপুরের রাজধানী রামপাল নগরেই আসিয়াছিলেন (৫)। আদিশূরের সময়ে রামপাল যে তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহা আমরা লঘুভারতে দেখিতে পাই (৬)।

(১) ক্ষি° ব° ২পৃঃ।
(২) ব° যো° ৩২০পৃঃ—

হুতবহশমতাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
সুরসরিদ্বিধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং॥ ঐ, চি, ৮৪পৃঃ

(৩) ব° যো° ৩২৮—২৯পৃঃ।
(৪) ব° যো° ৩৩০পৃঃ।
(৫) স নি° ১৫পৃঃ।
(৬) আস্তে বঙ্গসন্নিধৌ বন্যো রামপালেতি বিশ্রুতা।

১০১। মল্লকাষ্ঠের আখ্যায়িকা।

যাঁহাদের মতে পঞ্চব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম রামপালে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজমত সমর্থনে একটী আখ্যায়িকা উল্লেখ করেন। ব্রাহ্মণেরা "চরণে চর্ম্মপাদুকা, সর্ব্বাঙ্গ সূচিবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, এইরূপ বেশে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজার নিকট আগমনসংবাদ দাও। * * রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিবেন, ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত জলগণ্ডূষহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে রাজা তাঁহাদের বেশের বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন না। তখন ব্রাহ্মণেরা করস্থিত আশীর্ব্বাদবারি নিকটস্থ এক মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সঞ্জীবিত, পল্লবিত ও ফলফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিল। * * * বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দীঘি আছে, তাহার উত্তর পাড়ে পাকা ঘাটের উপর ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ, নাম গজারি বৃক্ষ। এতজ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরে আর কোথাও নাই" (৭)। বাচস্পতি এবং দেবীবরও এই আখ্যায়িকা সমর্থন করেন (৮)। বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার কুলরামেও এই আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন (৯)। এই গজারি বৃক্ষ সম্বন্ধে "আদিশূর ও বল্লালসেন" রচয়িতা পার্ব্বতীশঙ্করবাবু বলেন—"বিক্রমপুরান্তর্গত মেঘনানদীর পূর্ব্ব উপকূলে রামপাল নামক স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড খাত বিদ্যমান আছে। এই সরোবরের নাম রামপাল দীঘি এবং এই নদী হইতে উক্ত মহালের নাম রামপাল হইয়াছে। সরোবরের অনতিদূরে পরিখাবেষ্টিত কতিপয় পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলের অধিবাসীগণ এই ভগ্ন অট্টালিকা বল্লালের রাজপ্রাসাদ বলিয়া পরিচয় দেয়। পরিখার স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বেষ্টিত ভূমিখণ্ডের বিস্তৃতি এবং বাহ্যাবয়ব দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এই স্থান এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত ও ধনশালী রাজার রাজধানী ছিল। ভগ্নপ্রাসাদের পুরদ্বারে একটী প্রাচীন গজাড়ী বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। সকলেই এই গজাড়ী বৃক্ষটীকে আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণপ্রদত্ত আশীর্ব্বাদে জীবিত মল্লকাষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে" (১০)। এই আখ্যায়িকার ভিতর কোন্ ঐতিহাসিক সত্যের কতটুকু নিহিত আছে, তাহা বর্ত্তমানে বাহির করা অত্যন্ত দুরূহ। তবে এইটুকু মনে হয় যে, রামপালে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনসংক্রান্ত কোন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। "রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিবংশ"লেখক ৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, "পালবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজধানী বগুড়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল, শূরবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী দিনাজপুরের অন্তর্গত মালাদহের (মালদহ) নিকটবর্ত্তী স্থানে কালিন্দী নদী ও মহানন্দা সংযোগে অবস্থিত ছিল; বল্লালসেনের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল; এবং লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপে ছিল (১১)। ইহার সমর্থনে তিনি কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই।

১০২। হোম কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

আমাদের অনুমান হয় যে, পঞ্চব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম রামপালে উপস্থিত হইলেও সেখানে কোন যজ্ঞ, অন্তত পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদন করেন নাই। পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্ভবত গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নগেনবাবু বলেন, "আদিশূর যে সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে তৎকালে রাজধানী ছিল" (১২)। আদিশূর-

নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতে।
সং ভা• ২য় খণ্ড ১২৭—২৮পৃঃ, গৌ• ব্রা• ২৬২পৃঃ,
ব• মো• ৩২৮ পৃঃ।

(৭) ক্ষি• ব• ২—৩পৃঃ। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত বহুবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব—ব• মো• ৩৩০—৩৩১পৃঃ।

(৮) ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ।
স্থাপয়ামাসুরর্ঘ্যং তৎ শুষ্ককাষ্ঠস্য মস্তকে॥
দূর্ব্বাতণ্ডুলপুষ্পাদিনির্ম্মিতং জলসংযুতং।
তদর্ঘ্যং মস্তকে ধৃত্বা শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ জীবিতং॥ বা• প•
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ।
আশীর্ব্বাদার্থ নির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরি ধৃতং।
তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লবসংযুতং॥
দেবীবর—ব• মো• ৩৩১পৃঃ।

(৯) ব্রা• কা• ১০৬পৃঃ।

(১০) ব্রা• কা• ১০৫পৃঃ।

(১১) রা• ব্রা• ৪পৃঃ।

(১২) ব্রা• কা• ১০৭—৮পৃঃ।

পুত্র ভূশূরের ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বিতাড়িত হইবার কথা কুলগ্রন্থে উল্লিখিত হইবার কারণে আমাদের অনুমান হয় যে, গৌড়জয়ের পর অবধি রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই রাজধানী নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এবং রামপাল পৈতৃক রাজধানী ছিল। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের "এক ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে 'হোমদীঘী' বা 'হোমাংদীঘী'নামে এক প্রাচীন স্থান আছে, কেহ কেহ মনে করেন, এখানে আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণ হোম করিতেন" (১৩)।

১০৩। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায়?

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর কোথায় অবস্থিত ছিল, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়া বলেন—"গৌড়নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। কথাসরিৎসাগর পাঠে কতকটা বুঝা যায়, পৌণ্ড্রনগরী কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিউ-এন-সিয়াং এই নগরে আসিয়াছিলেন, অনেক নৌ-কার্য্যালয় দেখিযাছিলেন। তিনি গঙ্গা উত্তীর্ণ হইযা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে প্রবেশ করেন। * * * প্রসিদ্ধ মালদহ নগরের দুই ক্রোশের উত্তর পূর্ব্বে ও গৌড় নগর হইতে ৮ক্রোশ উত্তরে ফিরোজাবাদ নামে এক অতি প্রাচীন স্থান আছে। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে 'পোঁড়োবা' বা 'পুঁড়োবা' (বড় পুঁড়ো) নামে অভিহিত করে। এই স্থানের এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ও মালদহের আড়াই ক্রোশ উত্তরে 'বার-দোয়ারী পুঁড়োবার' ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। পোঁড়োবা অথবা পুঁড়োবা শব্দ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অথবা পুণ্ড্রবর্দ্ধন শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্থানীয় লোকেরাও বলিয়া থাকেন যে, এখানে বহুকাল গৌড়ের রাজগণ আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ, বহুতর ভাস্কর ও শিল্পসমাযুক্ত ভগ্ন মন্দিরাদির নিদর্শন, এবং বহুসংখ্যক কূপতড়াগাদির প্রাচীন গর্ত্ত এখানকার হিন্দুরাজত্বের অতীত কীর্ত্তি বিশেষরূপে ঘোষণা করিতেছে। এই ধ্বংসাবশেষ পুঁড়োবার 'বারদোয়ারী' হইতে দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গাতট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশের অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। * * * এই স্থান এখনকার গঙ্গাস্রোত হইতে প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিন্তু এখনকার নদীর অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। বর্ত্তমান মালদা সহরের পরপারে যে কালিন্দী নদী বহিতেছে, এক সময়ে ভাগীরথী এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত। মালদহের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভাগীরথীপুর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম রহিয়াছে। তাহারই কিছু দূরে ভাগীরথীনামে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বুড়ীগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বকালে এই ভাগীরথী দিয়াই গঙ্গার মূলস্রোত বহিত ও মালদার পার্শ্বে প্রবাহিত মহানন্দার অদূরে কালিন্দীর সহিত মিলিত ছিল। সুতরাং বহুজনাকীর্ণ বিখ্যাত পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন নগর গঙ্গার অনতিদূরে ও মহানন্দার তট হইতে বর্ত্তমান 'বারদোয়ারী' পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল, তাহা অসম্ভব নহে (১৩)।

১০৪। যজ্ঞান্তে দক্ষিণাপ্রাপ্ত পঞ্চগ্রাম।

প্রসিদ্ধি আছে, আদিশূর যজ্ঞসমাপনান্তে দক্ষিণাস্বরূপে পঞ্চব্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করেন (১৪)। সেই পাঁচখানি গ্রাম কি কি, এবং সেগুলি কোথায় অবস্থিত, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। হরিমিশ্র প্রভৃতি কুলাচার্য্যের মতে পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আসিলে গৌড়াধিপ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাদিগকে যথারীতি পূজা করিয়া বসবাসের জন্য পাঁচখানি "শাসন" গ্রাম দিয়াছিলেন (১৫)। সম্বন্ধনির্ণয়কার বলেন—ভট্টনারায়ণ পাইয়াছিলেন পঞ্চকোটি, দক্ষ পাইলেন কামকোটি, ছান্দড় পাইলেন হরিকোটি, শ্রীহর্ষ কঙ্কগ্রাম এবং বেদগর্ভ বটগ্রাম (১৬)। এই কয়টি গ্রাম যে আদিশূর বাছিয়া বাছিয়া ইহাঁকে উহাঁকে দিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। সম্ভবত আদিশূর যজ্ঞান্তে পঞ্চব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; পাঁচজনের নিকট শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে গ্রাম নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই গ্রামই দেওয়া হইয়া-

(১৩) ব্রা০ কা০ ১০৩পৃঃ।

(১৪) Tagore Family পৃঃ ৪।

(১৫) ব্রা০ কা০ ১৩০পৃ.।

(১৬) পঞ্চকোটি. কামকোটির্হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ। স০ নি০ ১৮পৃঃ

ছিল (১৭)। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে, যজ্ঞান্তে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে বহুসৌধশোভিত পুরপঞ্চক বাস করাইয়াছিলেন (১৮)। মনে হয়, এখানে ঐ দক্ষিণাস্বরূপে প্রদত্ত পঞ্চগ্রামই উদ্দিষ্ট হইযাছে।

১০৫। পঞ্চগ্রামের অবস্থান।

নগেনবাবু বহু অনুসন্ধান করিযা কামটি বা কামকোটি গ্রাম ব্যতীত অপর চারিটী গ্রামের অবস্থান যাহা নির্দ্দিষ্ট করিযাছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল (১৯)—

(ক) ব্রহ্মপুরী।—ব্রহ্মপুরীর বর্ত্তমান নাম ব্রহ্মপুর। ইহা মালদহ হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ও ভাগীরথীর ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষাং ২৪°৫৩′৫৫″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°৮′৩৫″ পূঃ)।

(খ) হরিকোটি।—হরিকোটির বর্ত্তমান নাম হরিপুর। ইহা ভাগীরথীপুরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ও কালিন্দী নদীর দক্ষিণে বিদ্যমান (অক্ষাং ২৫°৩′ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°৬′৪৫″ পূঃ)।

(গ) কঙ্কগ্রাম।—কঙ্কগ্রামের বর্ত্তমান নাম কাঁকডী। এখন ম্ফলাতি জেলায় ও গঙ্গার দেড ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত (অক্ষাং ২৪° ৩৮′ ৪৫″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ২′ পূঃ)।

(ঘ) বটগ্রাম।—বটগ্রামের বর্ত্তমান নাম বটরিযা বা বটোড়ি। মালদহ জেলায গঙ্গার তটে অবস্থিত (অক্ষা° ২৪° ৪৬′ ৪৫″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১৩′ ৫০″ পূঃ)।

মুলোপঞ্চাননের গোষ্ঠীকথায আমরা এ সম্বন্ধে পাই—হরিকোটি (মেদিনীপুর) কংসাবতী নদীর তীরবর্ত্তী, পঞ্চকোটির সীমা মল্ল, বরাহ, শিখর, সিংহভীবভূম প্রভৃতি মালক্ষেত্রের (মালভূমের) নগর; কামকোটি হইল নিশ্চিত বীরভূম; কঙ্কগ্রাম হইল "বাণকুণ্ডা, গঙ্গা হইতে দূর"; এবং বটগ্রাম বর্দ্ধমানে (২০)।

এই চারি গ্রামেরও আর পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির কিছুই নাই; সগুবাক নারিকেলাদিশোভিত (তাম্রশাসন বর্ণিত) ব্রাহ্মণ শাসনগ্রামের এখনও কতক কতক নিদর্শন রহিয়াছে। যাঁহারা উড়িষ্যার ব্রাহ্মণশাসনগ্রামসমূহ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অনাযাসে উক্ত চতুর্গ্রামের প্রাচীন নিদর্শন কতকটা বুঝিতে পারিবেন। (২১)।

১০৬। যজ্ঞান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন?

একটী প্রবাদ আছে যে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ যাঁহারা করিযাছিলেন, তাঁহারা যজ্ঞসমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিযাছিলেন। সেখানে অনাদৃত হইযা গৌড়ে ফিরিযা আসেন। কুলতত্ত্বার্ণব বলেন যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ যজ্ঞসমাপনান্তে স্বদেশে ফিরিযা গেলেন; কিন্তু বঙ্গদেশে যাওযা এবং অজ্ঞাত জনের যাজকতার জন্য জ্ঞাতিগণ তাঁহাদিগকে প্রাযশ্চিত্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা রাজা বীরসিংহকে সেই বিষয় জানাইলে বীরসিংহ জ্ঞাতিবর্গকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেও তাঁহারা সেই পঞ্চব্রাহ্মণকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে কিছুতেই তাঁহাদিগকে পুনর্গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহারা পুত্রকলত্র ও ভৃত্যগণের সহিত বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা আদিশূরের নিকট সমস্ত বিবরণ বলিলে আদিশূর তাঁহাদিগকে গঙ্গার তীরবর্ত্তী পঞ্চগ্রাম দান করেন (২২)।

(১৭) পূর্ব্বভূপ আদিশূর আনে পঞ্চজন।
দেন তিনি পঞ্চগ্রাম যায় যাতে মন ॥ ৫
হরিকোটি পঞ্চকোটি কামকোটি তিন।
কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, সবে পায় চিন ॥ ৬
হরিকোটি চান্দড়ে পঞ্চকোটি যে তটে।
কামকোটি দক্ষে কঙ্কগ্রাম হসে আটে ॥ ৭
বেদগর্ভে বটগ্রাম রাজা দিল বাসে। ৮
গোষ্ঠকথা—সং নিং ৫৫৯পৃঃ।

(১৮) ক্ষিং বং ৫পৃঃ।

(১৯) ব্রাং কাং ১১১পৃঃ।

(২০) গোষ্ঠকথা—সং নিং ৫৫০পৃং।

(২১) ব্রাং কাং ১১১—১১২পৃ।

(২২) এবং সমাপ্য যজ্ঞঞ্চাদিশূরস্য ভূপতেঃ।
জগ্মুঃ স্বদেশং তুর্ণস্তে বিপ্রাঃ বেদবিশারদাঃ ॥ ৭০
গতেষু দ্বিজদেশেষু স্বদেশস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
উচুস্তান্ বান্ধবাঃ সর্ব্বে নাস্মাভির্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭১
বঙ্গদেশে চ গমনাদজ্ঞাতজনযাজনাৎ।
যূয়ং পাতিতাঃ পন্থা ন স হ দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৭২
অস্মাকং গ্রহণীয়াশ্চেৎ যূয়ং ভবিতুমিচ্ছথ।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কুরুত পুনঃ সংস্কারমাপকং ॥ ৭৩
ইতি শ্রুত্বা গিরো বিপ্রা বীরসিংহান্তিকং তদা।
গত্বা সমস্তবৃত্তান্তং কথয়ামাসুরংশুতে ॥ ৭৪
ততো রাজা সমাহূয় ব্রাহ্মণান্ প্রাহ বিস্তরং।
প্রায়শ্চিত্তং বিনা কোঽপি স্বীকারং ন চকার হ ॥ ৭৫
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ ভার্য্যাপুত্রাদিভিঃ সহ।
সরক্ষকাঃ কান্যকুব্জাৎ বঙ্গদেশং পুনর্যযুঃ ॥ ৭৬
সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুরাদিশূরনৃপান্তিকে।
তেষাং বচনমাকর্ণ্য রাজা হর্ষমুপাগতঃ ॥ ৭৭

কিন্তু কুলতত্ত্বার্ণবের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতি স্বদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই ঐ পঞ্চকোটি (বা ব্রহ্মপুরী) প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম পাইয়াছিলেন। সম্ভবত পঞ্চকোটির অপর নাম ছিল ব্রহ্মপুরী, অথবা ভট্টনারায়ণ পঞ্চকোটি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তাহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মপুরী রাখিয়াছিলেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে কুলতত্ত্বার্ণবের মতই সমর্থিত হইয়াছে দেখি (২৩)। প্রেমবিলাস গ্রন্থে কিন্তু এই সঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতির সঙ্গে প্রথমে ভট্টনারায়ণ, সুসেন, ধবাধব, গৌতম এবং পরাশর আসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে দামোদর, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ আসিলেন (২৪)। আমাদের মতে কুলতত্ত্বার্ণব বা প্রেমবিলাসে উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণের জাতিচ্যুতির আখ্যায়িকা যুক্তিসহ নহে।

১০৭। জাতিচ্যুতির আখ্যায়িকা যুক্তিসহ নহে।

আদিশূরকে নীচ ক্ষত্রিয় বা অজ্ঞাতকুল বলিয়া বলা হইয়াছে; ইহাতেই অনুমান হয়, কোনও অজ্ঞাত কারণে, সম্ভবত বৈদ্যজাতিকে সম্মানে একটু লঘু করিবার জন্যই, আদিশূরকাহিনীতে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনসূত্রে এই আখ্যায়িকার সমাবেশ করা হইয়াছে। কুলগ্রন্থমতেই তো দেখা যায় যে, পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য দ্বিতীয়বার আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনেন। আর, আদিশূর তো বীরসিংহের জামাতা ছিলেন এবং বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। যদি কোনও গোলযোগ হইয়াই ছিল, তাহা প্রথমবারে হইবার কথা। আর প্রথমবারে যদি-বা তাহা হইয়াই থাকে, তবে বীরসিংহ এত বড় মূর্খ ছিলেন না যে, নিজে অপমানিত হইবার জন্য পুনরায় পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গে পাঠাইতে স্বীকার করিবেন। হইলেও হইতে পারে যে, সম্ভবত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্ষিতীশ প্রভৃতি যজ্ঞসম্পাদন করিয়া যখন দেশে ফিরিয়া যান, তখন জ্ঞাতিবিরোধের কারণে এবং আদিশূরের নিকট তাঁহাদের "প্রাপ্তি" দেখিয়া জ্ঞাতিরা তাঁহাদিগকে স্বদেশে "কোণঠেসা" করিয়াছিলেন, কিন্তু বীরসিংহ নিশ্চয়ই তাহা মিটাইয়া দিয়াছিলেন, অথবা কোন উপায়ে তাহা চাপা পড়িয়াছিল। সম্ভবত সেই ঘটনাটী কোন কারণে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রেমবিলাসের উক্তি আমরা স্বীকার করিতে পারি না, আরও এই কারণে যে, সমস্ত কুলগ্রন্থে প্রেমবিলাসের বিপরীতে একবাক্যে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের একত্র গৌড়ে আগমন বলা আছে। আমরা অনুমান করি যে, জাতিচ্যুতির কারণে নহে, কিন্তু বঙ্গদেশ রমণীয় অর্থাৎ আহারাদি বিষয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্যপ্রদ বলিয়াই পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যান্য পুত্রেরা ক্রমশ বঙ্গে আসিয়াছিলেন। জাতিচ্যুত না হইলেও ক্ষিতীশ প্রভৃতিকে বোধ হয় দেশে বেশ একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, তাই বীরসিংহ আদিশূরের প্রার্থনা ঘোষণা করিতেই ক্ষিতীশ প্রভৃতির বংশধরেরাই বঙ্গে যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন।

১০৮। দক্ষিণা ব্যতীত পঞ্চ অনুগঙ্গ গ্রাম প্রদত্ত।

কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, দক্ষিণাস্বরূপে পঞ্চব্রাহ্মণ যে পাঁচখানি গ্রাম পাইয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত তাঁহাদের বসবাসের জন্য গঙ্গার তীরবর্ত্তী আরও পাঁচখানি গ্রাম দেওয়া হইয়াছিল। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে যে, "যজ্ঞান্তে পঞ্চব্রাহ্মণকে বহু সৌধশোভিত পুরপঞ্চকে বাস করাইলেন; সেই পুরপঞ্চকে এক বৎসর বাস করিবার পর ভট্টনারায়ণের নানা লোকাতীত কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে (এবং সম্ভবত অন্য চারিজনকেও) রাজা গ্রাম দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন" (২৫)। ক্ষিতীশবংশাবলীতে কেবলমাত্র ভট্টনারায়ণের কথা উল্লিখিত থাকিলেও আমাদের অনুমান যে রাজা তাঁহাদের সকলকেই আরও এক একখানি গ্রাম দিয়াছিলেন। গোষ্ঠীকথায় আমাদের এই অনুমানের সমর্থন পাই। মুলোপঞ্চানন বলেন—ছান্দড় হরিকোটি ব্যতীত গঙ্গাবাসের জন্য ত্রিবেণী পাইয়াছিলেন; ভট্টনারায়ণ পঞ্চকোটি ব্যতীত কালীঘাট পান; দক্ষ কামকোটি ব্যতীত জাহ্নবীনগর ভর্ত্তাপুর (ছাপ-

---

বাসার্থং পঞ্চবিপ্রাণাং গঙ্গাতীরসমীপতঃ।
পঞ্চ গ্রামান্ দদৌ তূর্ণং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৭৮

(২৩) প্রে০ বি০ ২৬০পৃঃ।

(২৪) প্রে০ বি০ ২৬০পৃঃ।

(২৫) ক্ষি০ ব০ ৪পৃঃ—ক্ষিতীশবংশাবলীতে কেবল ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে একথা বলা আছে, আমাদের তাহা সঙ্গত মনে হয় না।

ঘাটিয়া মহাল) পান; শ্রীহর্ষ কঙ্কগ্রাম ব্যতীত গঙ্গাবাসের জন্য অগ্রদ্বীপ পান; এবং বেদগর্ভ বটগ্রাম ব্যতীত শান্তিপুরের অপর পারে গুপ্তপল্লী (গুপ্তিপাড়া ?) প্রাপ্ত হন (২৬)।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়-সম্পত্তি।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ)

দ্বারকানাথের উইল।

১৮৪৩ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে দ্বারকানাথ উইল করেন। পূর্ব্বে যে Deed of Settlmentএর কথা বলা হইয়াছে, যাহার দ্বারা দ্বারকানাথ অধিকাংশ বিষয়সম্পত্তির উপরে পুত্রগণকে কেবল জীবনস্বত্ব এবং পৌত্রগণকে নিব্যূঢ় স্বত্ব দান করিয়া যান, তাহা এই উইলে স্বীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হয়; এবং ঐ Deedএর অতিরিক্ত যে সম্পত্তি দ্বারকানাথের মৃত্যুকালে থাকিবে, তাহার সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করা হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর ৭১পৃষ্ঠায় এই উইলের ব্যবস্থার বিবরণ দিয়াছেন।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এবং নানারূপ অর্থী প্রত্যর্থীগণ, উইলে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য স্বভাবতই অতিশয় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখের *Englishman* পত্রিকায় "Local Items" শীর্ষে আমরা এই সংবাদ দেখিতে পাই :—

"Dwarkanauth's Will is now the rage. From the poor sircar to the Member of the Council, evrybody would have a sight of this document; some from curiosity, but most from interested motives."

ইহার পর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখের *Englishman* পত্রিকায় দেখিতে পাই যে, এই সময়ে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে ঐ উইলের একটি অস্পষ্ট উক্তির অর্থ পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য একটি মোকদ্দমা (suit) উপস্থিত করা হইয়াছিল; তাহাতে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাদী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিবাদী বলিয়া লিখিত আছে। এস্থলে আইনে অনভিজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই সকল মোকদ্দমা কোনও কলহ-বিবাদের মোকদ্দমা নহে; এসকল কেবল ভবিষ্যৎ জটিলতা নিবারণের উদ্দেশ্যে দলীলাদির অর্থ স্পষ্ট করিয়া লইবার মোকদ্দমা। কিন্তু এ সকলেও একজনকে বাদী ও একজনকে প্রতিবাদী হইতে হয়। এই মোকদ্দমার বিবরণে দেখিতে পাই যে, দ্বারকানাথ নিজ উইলে কার ঠাকুর কোম্পানীকে "one million rupees" অর্থাৎ দশ লক্ষ টাকা ধার দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

উইলের যে অস্পষ্ট উক্তি লইয়া এই মোকদ্দমা হয়, তাহা *Englishman* পত্রিকায় এইরূপ উদ্ধৃত আছে,—"And as to all the residue and remainder of my real and personal estate and effects whatsoever or whosoever, I give devise and bequeath the same unto all and every my sons and son, and their and each and every of their respective sons per stripes who shall survive me, if more than one in equal shares, to and for his and their own absolute use and benefit."

ইহার পর *Englishman* বলিতেছেন, "The question being as to the meaning of the above residuary clauses, the sons claiming the whole residue thereunder in equal third parts or shares to the exclusion of the grand-sons,......Peel, C. J., held the demurrer be allowed." অর্থাৎ residuary property তিন পুত্রই সমান অংশে পাইলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে এই মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের য়ুরোপীয় পৃষ্ঠপোষকগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং কার ঠাকুর কোম্পানীর বিস্তৃত বাণিজ্যের সহিত ইহার যোগ থাকাতে ক্রমে ইহাই কলিকাতার প্রধান ব্যাঙ্ক হইয়া দাঁড়াইল। এই রূপে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক অংশীদারের আগমন হেতু ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে দ্বারকানাথের আর্থিক দায়িত্ব কিঞ্চিৎ লঘুতর হইতে লাগিল বটে; কিন্তু কার ঠাকুর কোম্পানী প্রায় একা দ্বারকানাথের টাকার বলে, এবং তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে লোকের অগাধ বিশ্বাসের বলেই, চলিতে লাগিল। এই কোম্পানীর বাণিজ্য যতই বহুমুখীন হইয়া প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই ইহার ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের, উভয়ের, আর্থিক দায়িত্বের পরিমাণ অত্যধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কার ঠাকুর কোম্পানী এবং দ্বারকানাথের বিষয়সম্পত্তি, এই তিনটির জীবন-মরণ প্রায় পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়া পড়িল; দাঁড়াইলে তিনটিই দাঁড়াইবে, পড়িলে তিনটিই একসঙ্গে পড়িবে। এই অবস্থায়

(২৬) মুখোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীকথা—সং নিং ৫৫৩পৃঃ।

অথচ ভাবিলে দ্বারকানাথের পক্ষে ভূসম্পত্তি রক্ষার জন্য Deed Settlement সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

১৮৪০ সালের কাছাকাছি সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় ফেল হয়। যতদিন দ্বারকানাথ জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি বাণিজ্য জগতের এই সকল ঝঞ্ঝাবর্ত্ত-প্রসূত বিপদ, এবং নিজ মুক্তহস্ততা-প্রসূত বিপদ, এই উভয় বিধ বিপদ অতিক্রম করিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধিবলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানীকে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আর ইহারা অধিক দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না।

১৮৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে উক্ত উভয় ব্যবসায়ের প্রধান স্তম্ভটি যেন খসিয়া পড়িল। ১৮৪৭ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর, সোমবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন ঘটিল।

১৮৪৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের *Englishman* পত্রিকা লিখিতেছেন, "On Friday last a demand on the Union Bank for so small a sum as three thousand five hundred rupees was dishonoured, and could not be met when presented yesterday, though it was ultimately adjusted before business closed, ...but probably something will transpire in the course of the day." তার পরের দিনের *Englishman* লিখিতেছেন,—"We are informed that a bill granted by the Union Bank for Co's Rs 60,000 due on Monday remained unpaid, and was in the hands of the Notary yesterday. We have again and again pointed out to the Shareholders the necessity of closing the concern without delay. We have now some facts before us which make this more than ever important to their interests."

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিতেছেন,—"ব্যাঙ্কের পক্ষে যে যে প্রণালীতে কারবার করা বিধিসঙ্গত, তাহার সীমা লঙ্ঘন করিতে গিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সর্ব্বনাশ হইল। কয়েকটি বিশেষ হৌসকে নীলের জন্য ধার দিয়া দিয়া ইহার টাকা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। নীলের জন্য ঋণ দান, ও হুণ্ডীর কারবার, এই দুইটিই এই ব্যাঙ্ক ফেল হইবার প্রধান কারণ।"— (Mem. 15; সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

দ্বারকানাথের আর্থিক সচ্ছলতার উপরে লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল বলিয়া তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী উভয়ের জন্য সহজে টাকা ধার পাইতেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক সম্পর্কে নিমতলার দেওয়ান রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি সর্ব্বদা প্রয়োজনমত এই ব্যাঙ্কে টাকা যোগাইতেন।

ব্যাঙ্ক ফেল হইলে রমানাথ ঠাকুর ইহার লিকুইডেটর নিযুক্ত হন। এই ব্যাঙ্কের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের এষ্টেট অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। তাহা হইতে, দ্বারকানাথের ক্রীত শেয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী, ঋণের হারাহারি অংশ মাত্র শোধ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের সমগ্র ঋণ শোধ না হওয়াতে কলিকাতার অনেক বর্দ্ধিষ্ণু ঘর ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হন। তৎকালীন সংবাদপত্র সকলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে দেশীয় ও য়ুরোপীয় উভয় সম্প্রদায় অতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের *Bengal Hurkaru* পত্রিকার সম্পাদকীয় উক্তিতে এই ব্যাঙ্কের পতনের দীর্ঘ সমালোচনা আছে।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর কার ঠাকুর কোম্পানীর ইতিহাস।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তিনি নিজ উইলে কার ঠাকুর কোম্পানীর বিষয়ে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর ৭১পৃষ্ঠায় সে সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—"আমাদের কার ঠাকুর কোম্পানি নামে যে বাণিজ্যব্যবসায় ছিল, তাহার অর্দ্ধেক অংশ আমার পিতার, আর অর্দ্ধেক অংশের অংশী অন্য অন্য ইংরাজ সাহেবেরা ছিলেন। ইহার মধ্যে এক আনা অংশ আমার ছিল। আমার পিতা, এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে অর্দ্ধাংশ ছিল, তাহা কেবল একা আমাকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্দ্ধাংশ আমি কেবল আপনার জন্য রাখিলাম না; আমরা তিন ভাইয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া লইলাম।" ১৮৪৬ সালের শেষভাগেই নিশ্চয় দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথের সহিত এই কোম্পানী সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া থাকিবেন। কারণ *Englishman* পত্রিকার ১৮৪৭ সালের ৯ই, ১২ই, ২২শে ও ২৬শে জানুয়ারীর সংখ্যাগুলিতে কার ঠাকুর কোম্পানীর একটি বিজ্ঞাপন বার বার প্রকাশিত হয়; তাহার মর্ম্ম এই যে, ১লা জানুয়ারী হইতে গিরীন্দ্রনাথকে অংশীদার করিয়া লওয়া হইল, ও ঐ তারিখ হইতে তাঁহাকে লইয়া এই

৫ জন অংশীদার হইলেন,—Debendernath Tagore, Henry Barkley Henderson, Donald Macleod Gordon, Greendernath Tagore, James Stuart.

কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করিবার কোনও বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যখন কার ঠাকুর কোম্পানি উঠিয়া যাইতেছে, লিকুইডেশনের ব্যবস্থা হইতেছে, কোম্পানীর নাম পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখনও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে কেবল দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথেরই নাম দেখা যায়। কার ঠাকুর কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ও তাহার বিষয়ে প্রসঙ্গ, তৎকালীন সংবাদপত্রে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন ও প্রসঙ্গ অপেক্ষা সংখ্যায় ও পরিমাণে অনেক অল্প।

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (৮৫পৃষ্ঠা) কার ঠাকুর কোম্পানীর পতনের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১৭৬৯ শকের ফাল্গুন=১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ), এবং পতন সময়ে তাহার দেনা-পাওনার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাও সমসাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত হিসাবের সহিত মিলিতেছে না।

কার ঠাকুর কোম্পানী অনেকগুলি ব্যবসায়ের "Secretary" (এখনকার ভাষায় "Managing Agents") ছিল। তন্মধ্যে একটি নাম ছিল "Family Endowment, Life Assurance, and Amunity Society"। এই Societyর বিজ্ঞাপনে *Bengal Hurkaru* পত্রিকার ১৮৪৮ সালের ৭ই জানুয়ারীর সংখ্যায় Secretary রূপে 'কার ঠাকুর কোম্পানীর' নাম, এবং ১৪ই জানুয়ারীর সংখ্যায় 'গর্ডন ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর' নাম রহিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ দুই তারিখের মধ্যবর্ত্তী কোনও তারিখে 'কার ঠাকুর কোম্পানী' প্রকাশ্যভাবে উঠিয়া গেল।

আশ্চর্য্য এই যে, উঠিয়া যাওয়ার কোনও বিজ্ঞাপন বা উল্লেখ তৎকালীন দুই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র *Bengal Hurkaru* এবং *Englishman*এ পাওয়া গেল না। যাহা হউক, *Calcutta Gazette* পত্রিকার ১৮৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়:—

"Mr. H. B. Henderson's term of Partnership in our Firm having expired, and Baboo Debendernath Tagore and Baboo Greendernath Tagore being desirous to retire from Commercial business, we have closed our Accounts to the 31st December last, to which date Debendernath and Greendernath Tagore will collect all assets and discharge all liabilities of the Firm.

The name of Carr, Tagore and Co. will henceforth be used only by Debendernath and Greendernath Tagore for the liquidation of the Concerns of our Firm to 31st December 1847. The business of the Firm will be continued by D. M. Gordon and James Stuart, under the name of Gordon, Stuart and Co.

12th January 1848. Carr, Tagore & Co."

এই বিজ্ঞাপন হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, (১) সে সময়ে partnerগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত হইতেন, কারণ Hendersonএর partnership "expire" করিল। আত্মজীবনীর ৭২পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর সাহেব-অংশীদারগণকে বেতনভোগী কর্ম্মচারী অংশীদারে পরিণত করা হয়। সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থায় তাঁহাদিগকে অংশীদার নিয়োগ করিবার সময়ে তাহা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য করা হইত। ৮৫পৃষ্ঠায় গর্ডন সাহেবকেও দেবেন্দ্রনাথ "প্রধান কর্ম্মচারী ডি এম্ গর্ডন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (২) ১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে কার ঠাকুর কোম্পানীর অস্তিত্ব আর নাই। (৩) ১৮৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত ঐ লুপ্ত কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা আদায় ও দেয় টাকা শোধ করিবার (লিকুইডেশনের) ভার দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ দুই ভাই লইলেন, এবং তাঁহারা কেবল ঐ কার্য্যের জন্যই ১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারীর পর হইতে কার ঠাকুর কোম্পানীর নাম (অর্থাৎ আত্মজীবনীর ৮৭পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'কার ঠাকুর কোম্পানী ইন্ লিকুইডেশন' নাম) ব্যবহার করিতে লাগিলেন। (৪) ঐ তারিখের পর হইতে হৌসের নাম আর 'কার ঠাকুর কোম্পানী' রহিল না, 'Gordon Stuart & Co.' হইয়া গেল, এবং দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের সহিত তাহার কোন সংস্রব রহিল না। এই কারণেই *Bengal Hurkaru* পত্রিকায় উক্ত সোসাইটীর বিজ্ঞাপনে ৭ই ও ১৪ই জানুয়ারী তারিখে Secretaryরূপে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর নাম রহিয়াছে। (৫) ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে আত্মজীবনীর ৮৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী ফিরাইয়া দেওয়া ও দরোজা বন্ধ করার ব্যাপার ১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারীর পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ এই ব্যাপার ১৮৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখেরও পূর্ব্বে, অর্থাৎ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের অব্যবহিত পরেই, ঘটিয়া থাকিবে।

১৮৪৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল কার ঠাকুর কোম্পানীর পাওনাদারদের একটি সভা হয়। ৫ই এপ্রিল তারিখের *Bengal Hurkaru* পত্রিকায় তাহার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ১২ই জানুয়ারী ও ৪ঠা এপ্রিলের মধ্যবর্ত্তী আর কোনও তারিখে অন্য কোনও সভা হইয়াছিল কি না, সন্দেহ। অন্ততঃ সংবাদ-পত্রে এরূপ কোনও সভার উল্লেখ নাই।

"MESSRS CARR TAGORE & CO.

The meeting of the Creditors of this defunct Firm took place last evening, Mr, Robert Castle Jenkins presiding.

The Chairman read the Circular addressed by the partners of the late Firm to their Creditors, and the statement of accounts, which we subjoin.

ASSETS,

Pledged.

Joint Stock Shares	Rs 4,19, 500
Indigo Blocks	2, 95, 000
Seebpore Works (Interest of Carr, Tagore & Co. in them)	50,000
Personal Account	400,000
Patkharah less 1st mortgage	200,000
Sundry small Home properties	50,000
Mundul Ghaut	200,000
	Rs 16, 14, 500

Unpledged.

Joint stock shares	Rs 54,450
Indigo Block	1,05,000
Indigo for 1848,21000* mds at 120—240,000; less required to finish season, 80.000	1,60,000
Silk Factories	1,05,000
Personal Account	8,64,000
	Rs 12,88,450
Total amount of Assets pledged and unpledged	Rs 29,02,950

LIABILITIES

Covered,

Loans on Joint Stock Shares	Rs 3,45,000
Sundry Security	7,70,000
Balance Indigo Account Sent in the Union Bank	5,20,000
	Rs 16,35,000

Uncovered.

Union Bank including Discounts Rs	4,25,000
Sundry Floating Accounts in India	70,000
Ditto ditto in Europe	1,76000
Ditto Fixed ditto	80,000
London Exchange Accounts	1,60,000
	Rs 9,11,000
Total of liabilities covered & uncovered	Rs 25,46,000

Mr. Morton, after referring to the Circular that had been issued by the Firm, said he was quite sure that all in the room would join him in sympathising with the sons of Dwarkanauth Tagore and their fellow-members in the late Concern for having fallen a victim, in common with so very many others, to the un-exampled pressure of the times. The estate was in difficulties; and as the most satisfactory mode of relieving it, he would propose that it may be placed under trust, since every thing seemed to favour such an arrangement; while a resort to the Insolvent Court could not but be attended with disadvantage to the claimants. The learned gentleman pointed out that hostility, especially on the part of a large Creditor, would be fatal to the execution of the plan he proposed, and exhorted unanimity and co-operation, that the affairs might be wound up to the satisfaction of all.

Mr. Colin Campbell seconded this proposition, and the meeting adopted it unanimously.

Mr. Morton now submitted a series of resolutions proposing that they should form the basis of a Deed of trust under which the Inspectors to be appointed should conduct their operations.

* এটা ২,০০০ হইবে, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। সম্ভবতঃ ২ এবং ০০০'র মধ্যে যে comma ছিল, মুদ্রাকর তাহার পরিবর্ত্তে ,1' বসাইয়াছিল।

The motion was seconded by Mr. Rob Roy Campbell, and carried unanimously.

Mr. W. F. Fergusson, in reference to one of these resolutions, which sanctioned the retention by the sons of Dwarkanauth Tagore, a certain portion of the personal property left them by their father, proposed that they be also allowed to retain the family residence at Jorasanko, and their personal property in it. In bringing forward this motion, Mr. Fergusson remarked that the known liberality and munificence of Dwarkanauth Tagore in public life, had also characterised him at home, and it was by no means improbable that a very large number of dependants maintained by him during his life time, now looked on his sons for support. The public was aware that the downfall of the house of Carr Tagore & Co. was not owing to the sons of Dwarkanauth, nor to the other partners that, with them, constituted the Firm; the Creditors could not blame them for extravagance,—they could not blame them for folly; and there therefore, appeared to him no ground for disallowing the indulgence he had proposed for Debendernauth Tagore and his brother; and he was satisfied that every creditor would cordially concur with him in this opinion.

Mr. Fergusson's motion was put to the vote, and carried by acclamation.

It was now proposed by Mr. Morton and seconded by Mr. Pillaus that Mr. Robert Castle Jenkins, Mr. F. R. Hampton, and Baboo Ramanauth Tagore be appointed Inspectors and Trustees.

The motion was put and carried unanimously.

The question of remuneration now arising, Mr. Fergusson remarked that, as the Inspectors would have the advantage of the services of the Partners of the late Firm, there seemed to him to be a reason why they should not charge such a rate of Commission as the Assignee of the Insolvent Court, upon whom fall the entire burden and expense. He would, therefore, propose that the Inspectors appointed content themselves with 3 per cent upon the realization, debiting the expenses of liquidation to the estate, as a matter of course.

The trustees expressed their willingness to accept of this amount of remuneration; Ramanauth Tagore remarking that, for his part, whatever should be his portion, he would gladly make over to his unfortunate nephews.

Mr. D. M. Gordon now came forward to assure the meeting that none of the partners of the defunct firm had benefited in the remotest degree by any portion of its funds. He was overpowered with emotion in speaking, and, in the end, even affected to tears. Although two of the partners had gone home, they had not taken out a rupee from the Concern. Mr. G. G. Macpherson had lived upon his own funds all the time that he had been in connection with the house, and, when he left Calcutta, he retired upon them. Nor had Major Henderson who had quitted Calcutta so recently, derived any profit for himself from the estate :—on the contrary, to meet certain immediate demands, he had found himself under the necessity of withdrawing part of a marriage settlement from the Firm.

Thanks were now voted to the Chairman, and the meeting separated."

এই সভার বিবরণে কার ঠাকুর কোম্পানীর যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে কোম্পানীর মোট দেনা ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ছিল; এবং কোম্পানীর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইলে ও সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় হইলে, (অর্থাৎ মোট assets ২৯ লক্ষ ২ হাজার ৯৫০ টাকা হাতে আসিলে) তাহার দ্বারা দেনা শোধ করা অসম্ভব হইত না।

কিন্তু যে-কোন একজন পাওনাদারের দাবী উপস্থিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইতে না পারিলেই হৌসের অথবা ব্যাঙ্কের পতন হয়। এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ যে মোট দেনা এক কোটি টাকা ও মোট পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত এই হিসাব মিলিতেছে না। ইহার কারণ কি? এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে দেবেন্দ্রনাথের বর্ণিত সভা *Bengal Hurkaru* পত্রিকার বর্ণিত সভার পূর্ব্বে হইয়াছিল, এবং সেই প্রথম সভাতে ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা ও হৌসের দেনা-পাওনা, দুইয়েরই হিসাব একত্র করা হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনাতে দেখা যায়, ঐ সভাতে প্রথমতঃ গর্ডন সাহেব জানাইলেন যে, ট্রষ্ট ডীড্ দ্বারা রক্ষিত সম্পত্তিসকল ঋণশোধার্থে দেওয়া হইবে না; তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ তাহাও ঋণের জন্য দিতে সাগ্রহে স্বীকৃত হইলেন; এবং সভাভঙ্গের সময়ে সকলে এই ধারণা লইয়া চলিয়া গেলেন যে ট্রষ্ট সম্পত্তিও ঋণশোধে যাইবে।

কিন্তু আমরা জানি যে কার্য্যতঃ তাহা ঘটে নাই। দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় মহত্ত্ব গুণে ঐরূপ প্রস্তাব করিলেন বটে, কিন্তু স্বল্প বিবেচনায় পরেই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে দেবেন্দ্রনাথের (কিংবা কাহারোই) ঐ Deed of Settlement এর দ্বারা রক্ষিত সম্পত্তির উপরে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। *Bengal Hurkaru* পত্রিকার সভার বিবরণে দেখা যায়, পাওনাদারগণ বিনা আপত্তিতে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতেছেন যে ঐ সকল সম্পত্তি দ্বারকানাথের পুত্রগণেরই থাকিবে; বরং তদুপরি তাঁহারা দ্বারকানাথের পুত্রগণকে জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বসত বাটীখানিও রাখিতে অনুমতি দিতেছেন।

এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আত্মজীবনীতে উল্লিখিত সভা ও *Bengal Hurkaru* পত্রিকায় বর্ণিত সভা এক নহে; আত্মজীবনী-বর্ণিত সভা আগে হইয়াছিল; এবং তাহা কতকটা ঘরোয়া ভাবে ও পরামর্শ-সভার ভাবেই করা হইয়াছিল, তাহাতে কোন বিষয়ের আইন সঙ্গত মীমাংসা হয় নাই।

অথচ আত্মজীবনীর ৮৭ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ এমন সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা formal meeting এর মীমাংসার সূচনা করে, যথা,—ভরণপোষণের জন্য পঁচিশ হাজার টাকার অনুমোদন, বিষয়পরিচালনের জন্য কমিটি নিয়োগ, কোম্পানীর লিকুইডেশনের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিতে একাধিক সভার ঘটনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারীর সন্নিহিত কোনও তারিখে আহূত একটি সভার, এবং মার্চ-এপ্রিল মাসের দুইটি সভার ঘটনা আত্মজীবনীর ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের আরম্ভের বিবরণে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।*

দেবেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পতিত ঋণভার।

ব্যবসায় পতনের পর দেবেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পিতৃকৃত ব্যক্তিগত ঋণ, হৌসের ঋণ, ও পিতার উইলে প্রতিশ্রুত দানের ঋণ, এই সকলের গুরুভার আসিয়া পড়িল। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-প্রণেতা লিখিতেছেন, "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানীর কার্য্য-পরিচালনার্থ দ্বারকানাথের বিস্তর ঋণ হয়। দ্বারকানাথকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তখনকার কলিকাতার প্রভূত ধনশালী ৺রামদুলাল সরকারের বংশধরেরা, রাজা সুখময়ের বংশধরেরা, বীরনৃসিংহ মল্লিকের বংশধরেরা, ৺জয়রাম মিত্র, রাজচন্দ্র দাস (মাড়), রাণী কাত্যায়ণী (পাইকপাড়া) প্রভৃতি, এবং কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ, বর্দ্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তি, অনেক সময় বিস্তর টাকা বিনা লেখাপড়াতেই কর্জ্জ দিতেন। বিলাতে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় এই সকল ব্যক্তির অনেকের নিকট অনেক টাকা দেনা পড়িয়া যায়, এবং দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ পিতার বিপুল বিত্তপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপুল ঋণভারেরও উত্তরাধিকারী হন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁহারা অধিকাংশ বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিপুল পিতৃঋণ পরিশোধ করেন।"—(ব. জা. ই, ব্রা. ৬। ৩৫৫)

এই "অধিকাংশ বিষয়সম্পত্তি" বলিতে ট্রষ্ট ডীড দ্বারা রক্ষিত সম্পত্তির বহির্ভূত অন্যান্য সম্পত্তি বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দেবেন্দ্রনাথ ট্রষ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে সাগ্রহান্বিত ছিলেন; কিন্তু আইনতঃ তাহা করা অসম্ভব ছিল বলিয়া উহা ঘটে নাই।

---

* শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল সম্পত্তি-ঘটিত প্রাচীন তথ্যে বিশেষ অভিজ্ঞ। মহর্ষির আত্মজীবনার ও সমসাময়িক সংবাদপত্রের বিবরণের মধ্যে এরূপ অসামঞ্জস্য দর্শন করিয়া তাহার সমাধানের জন্য খগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনিও কিছু মীমাংসা করিয়া দিতে পারিলেন না। তিনি বলেন, কার ঠাকুর কোম্পানী যে "ফেল" হয় নাই, voluntary liq idation এ গিয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে; আমার সংগৃহীত সংবাদপত্রের বর্ণনার সহিত খগেন্দ্র বাবুর এই উক্তির বিরোধ নাই। কিন্তু বোধ হয় এ ক্ষেত্রে "ফেল হওয়া"র ও volunntary liquidation এর পার্থক্য প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল না; কোন পাওনাদার ফিরিয়া গিয়া না থাকিলেও, সব পাওনাদারদের দাবী মিটাইবার টাকা যে মজুত নাই, তাহা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হইবার অব্যবহিত পরেই জানিতে পারা গিয়াছিল।

প্রত্যাদেশ ও পরীক্ষিত সত্য।

(ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরি ডি. এস-সি)

অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা জড়বাদিত্বের বদনামটা বৈজ্ঞানিকদের প্রতি অধিকতররূপে চাপান হইয়া থাকে। জড়বাদের বিশ্লেষণে আমরা বিজ্ঞানবিদকে সুবিধাবাদী ও ব্যবহারান্বেষী (utilitarian) বলিয়া ধরিয়া লই। এক সময়ে জড়বাদকে নিরীশ্বরবাদের নামান্তর বলিয়া ধরা হইত। কাজেই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, ব্যবহারিক জীবনের সুবিধাবিধানই বৈজ্ঞানিক গবেষণার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সিদ্ধান্ত বা অনুমান কি ঠিক? আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনীতে "ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান" প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিয়াছিলাম।* প্রবন্ধান্তরে উহার আলোচনা পাঠ করিয়া আরও কিছু যোগ করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। গ্যালিলিও পিসা সহরের স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ বাঁকা স্তম্ভের শিরোদেশ হইতে একই সময়ে ভারী ও পাতলা দুইটী ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ নিয়ে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের বিবৃক্ত গতির তারতম্য লক্ষ্য করার সময় তাঁহার কি কখনও মনে আসিয়াছিল যে, এই পর্য্যালোচনায় ব্যবহারিক জীবনের কোন শ্রমলাঘবকর উপায়ের আবিষ্কারের হেতু হইবে? আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, কোনও ব্যবহারিক শ্রমলাঘব উপায়ের উদ্ভব করিবার বা উদ্ধেশ পাইবার জন্য তিনি ঐরূপ পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করেন নাই। সকলেই আমেরিকা দেশবাসীদিগকে জড়বাদের প্রাধান্যের চরম দৃষ্টান্তস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অথচ এই আমেরিকাবাসীরা Michelson-Morleyর গবেষণার জন্য কতই না অর্থব্যয় ও সময়ক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সকলেই জানেন Michelson-Morleyর গবেষণা কোনরূপ ব্যবহারিক শিল্প বা কারখানার উন্নতিকল্পে উদ্দিষ্ট বা পরিকল্পিত হয় নাই। আর আমেরিকার সুবৃহৎ মানমন্দির আর তাহার বৃহত্তম দূরবীক্ষণগুলির কথা কে না জানে? আমেরিকাবাসীরা তাহাদের কারখানাগুলির বা তাহাদের ব্যবহারিক শিল্পের উন্নতিকল্পে এই সব মানমন্দিরের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করে নাই। এই সব মানমন্দিরের দ্বারা কত নক্ষত্রের ব্যাস মাপা হইয়াছে—লুব্ধকের প্রধান নক্ষত্র Siriusএর প্রভাহীন সঙ্গীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সুনির্ণীত হইয়াছে। এসব তত্ত্বে ত মানবের সাংসারিক বা দৈহিক শ্রমলাঘবের কোনও সহায়তা করে নাই বা সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া আমেরিকার জ্যোতির্ব্বিদেরা তাঁহাদের সময় ও শক্তির বিনিময়ে ঐ সুবৃহৎ ও সুগঠিত মানমন্দিরগুলির সাহায্যে ঐ সব অত্যাশ্চর্য্য তত্ত্বের নিরাকরণ করেন নাই। আমরা স্থানান্তরে এই সব তত্ত্বালোচনাকে বিধিলিপি-পাঠ বলিয়াছিলাম।* এই তত্ত্বানুসন্ধানীরা দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি সর্ব্বসময়ব্যাপী অনুসন্ধান, আলোচনা ও গবেষণায় নিমগ্ন থাকিয়া প্রকৃত নিয়মপ্রণালীর নির্ণয়ে নিযুক্ত। সত্যের সাধনা বিজ্ঞানের মোক্ষ। জড়বাদ বিজ্ঞানের পূর্ব্বগঠিত সিদ্ধান্ত নহে। বিজ্ঞানবিৎ সত্যের পথে প্রবেশপ্রয়াসী। সিদ্ধান্ত হইল সেই প্রয়াসের পরিসমাপ্তি। বৈজ্ঞানিকেরা প্রণালীর আবিষ্কারে নিযুক্ত থাকিবেন বলিয়া সমস্ত শক্তিসামর্থ্য উৎসর্গ করিয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বগঠিত সিদ্ধান্তের উপপত্তি তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মনগড়া কোন মত বা অভিমতের অন্ধ সমর্থন বৈজ্ঞানিকের কার্য্যপ্রণালীর নিয়ম নহে। জড়বাদ আজকাল আর বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তেমন পাওয়া যায় না যেরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির অনুগামীদের ভিতর পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের রাষ্ট্রবিৎদের শিক্ষাগুরু কার্ল মার্ক্স্ (Karl Marx) ইতিহাসের বিভাগ হইতে ভগবানকে বিদায় দিয়া মানুষকে তাহার সমসাময়িক অবস্থার উপায়হীন দাসরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। Karl Marxএর শিষ্যেরা গুরুর অনুগমন করিয়া মানুষের মানসিক শক্তিকে অর্থোৎপাদনের মূল হেতু স্বীকার না করিয়া কেবল শ্রমকেই (labour) ধনাগমের একমাত্র জনক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এইরূপ হেতুবাদে জড়বাদ বিজ্ঞানবিৎদের স্কন্ধ হইতে অর্থশাস্ত্রবিৎদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে।

সম্প্রতি মানচেষ্টারের নিকটবর্ত্তী সাউথ পোর্ট (South port) সহরে Church Congressএর অধিবেশন হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয়সূচক অনেকগুলি প্রবন্ধ এই কংগ্রেসে পঠিত হইয়াছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানীদের নিকট এই আলোচনা বড় প্রয়োজনীয় ও উপাদেয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মবেত্তাদের গভীর অধ্যয়নের গূঢ় উদ্দেশ্য আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুসৃত পথের চরম লক্ষ্য একই। আমরা তত্ত্ববোধিনীর পূর্ব্বোল্লিখিত 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে তাহা বিশেষভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ১৯০৬ খৃঃ অঃ ইয়র্ক নগরে বৃটিস এসোসিয়সনের সভাপতির অভিভাষণে প্রথিতযশা সার ই, রে, ল্যাঙ্কেষ্টর (Sir E. Ray Lankester) অতি বিশদভাবে বিষয়টি বিবৃত করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ সার ই, রে, ল্যাঙ্কেষ্টরের ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার উপর যে বিশেষ স্পৃহা বা ভক্তি আছে তাহা কেহ বলিবেন না। তবুও তিনি তাঁহার সেই অভিভাষণে খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকট বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৮৩৭ শক, পৌষসংখ্যা—১৭৮ পৃঃ।

* সুপ্রভাত ১৩১৮, জ্যৈষ্ঠ।

সহানুভূতির আবেদন জানাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ যুক্তিমূলক। উভয়েই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী ও সাংসারিক বিষয়সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা হইতে চিরস্থায়ী অনন্তের ভাবনা ও অনুসন্ধানে নিযুক্ত—চারিদিকের পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যিক ঘটনাবলীর মধ্যে এক অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য ও শাশ্বত কারণের অনুসন্ধানে নিরত। এই একই ভাবাপন্ন দুই বিভিন্ন পথের সাধনার্থীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির জন্য স্যার রে লেষ্টোর বিশেষ আশা ও অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

আমরা অস্বীকার করিতেছি না যে, বৈজ্ঞানিকদের ভিতর বিশেষত জীববিদ্যাচর্চ্চনশীলদের মধ্যে একদল লোক রহিয়াছেন যাঁহারা ধর্ম্মসম্প্রদায়ীদের মতবাদকে নানারূপ ভ্রান্ত সংস্কার ও কুসংস্কারের সমষ্টি ভাবিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন এবং এবম্বিধ ভ্রান্ত সংস্কারসমষ্টির সমূলোৎপাটন মানবের উৎকর্ষতা লাভের অনুকূল বলিয়া মনে করেন। অন্যপক্ষে এই জীববিদ্যাবিৎদের মধ্যেই আর এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা সুক্ষ্মদর্শী ও তত্ত্বানুসন্ধায়ী। তাঁহারা জানেন এবং বুঝিতে পারিতেছেন যে, মানবের উন্নতি মানবসমাজের উন্নতির সঙ্গে জড়িত। আর অন্যপক্ষে যত রকমের মানবসমাজ গঠিত হইয়াছে, আদিতে তাহার সবগুলিই ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মমত মূলরূপে গ্রহণ করিয়া গঠিত হইয়াছে। কাজেই মানবসমাজগঠনে ও মানবসমাজের ক্রমোন্নতিতে মৌলিক ধর্ম্মমতের প্রাধান্য স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ ভাবে গঠিত যে মানবসমাজ, তাহার অস্তিত্ব ও উন্নতি মৌলিক ধর্ম্মমতগুলির উপর নির্ভর করে। সরল ও সত্যভাবে এই ধর্ম্মমতের প্রভাব বিশ্বাস না করিলে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে, সৃষ্টিপ্রবাহের প্রণালীর বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলির সামঞ্জস্য সমাজবন্ধন-রক্ষার মূল হেতুভূত। একদিকে বিজ্ঞান সৃষ্টিপ্রবাহের নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতির প্রহেলিকার পথ সহজবোধ্য করিতেছে—অন্যদিকে ধর্ম্মবিশ্বাস যুগে যুগে যে সব মূল সত্য মহাপুরুষদের মধ্য দিয়া দৈবঘটনার ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সযত্নে রক্ষা করিতেছে। দৈববাণীর ন্যায় এই সব প্রত্যাদিষ্ট সত্য সমাজরক্ষার মূলীভূত হেতুরূপে রক্ষিত হইতেছে। এই প্রত্যাদিষ্ট সত্য পাশ্চাত্য দেশে Revelation রূপে গৃহীত হইয়াছে। সমসাময়িক জনমত এই প্রত্যাদিষ্ট সত্যের বহিরাবরণ। যুগে যুগে জনমতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদিষ্ট সত্যও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। জনমতের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিয়া বর্ত্তমান বোধগম্য ভাষায় ঐ সব প্রত্যাদিষ্ট সত্যের ভাষান্তর করার চেষ্টা ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মভাবরক্ষকদের প্রয়াস।

নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।

(শ্রীনারায়ণ ভারতী)

কাতারে কাতারে কৌরবপক্ষের অশ্ব, গজ, রথ, রথী, সেনাপতি এবং পদাতিক সৈন্যদলে কুরুক্ষেত্র ছেয়ে গেছে, কৌরবপক্ষের সকলেই রণোন্মত্ত, —পাণ্ডবদের রক্তের পিপাসায় সবাই তারা উদ্ভ্রান্ত, —ক্ষিপ্তপ্রায়! সবারই মুখে একই কথা,—রক্ত চাই, রক্ত চাই, পাণ্ডবদের রক্ত চাই!—কৌরবপক্ষের বীরেন্দ্র মহারথীবৃন্দ অস্ত্রে বর্ম্মে সজ্জিত হ'য়ে উৎকর্ণ ও উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা কর্‌ছে, কখন্ রণ-দামামা বেজে উঠ্‌বে,—কখন্ যুদ্ধারম্ভ হবে, ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় মুষ্টিমেয় পাণ্ডবকে ছিন্ন ভিন্ন করবার সুযোগ কখন্ তারা পাবে! কৌরবগণ একদৃষ্টে সকলেই চেয়ে রয়েছে পাণ্ডবদের দিকে! কিন্তু এই ভীষণ চাঞ্চল্যের মধ্যে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান—কে ঐ বিষাদজীর্ণ শ্যামলমূর্ত্তি? সারথির পার্শ্বে ম্লানমুখে অবস্থিত কে ঐ যোদ্ধ্‌বর? আজিকার যুদ্ধের পাণ্ডবপক্ষীয় সুপ্রধান সমরাচার্য্য উনিই কি কীর্ত্তিকুশল সেই অর্জ্জুন? হাঁ, তাই বটে। অর্জ্জুন এবং তাঁর সারথি কৃষ্ণ,—এতদুভয়ের পরস্পরে বর্ত্তমান যুদ্ধপ্রসঙ্গে বহু কথার আলোচনা হচ্ছিল। সহসা পার্থসারথি কৃষ্ণ, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে দৃঢ়স্বরে ব'লে উঠলেন, "নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে" অর্থাৎ তোমাতে এই দৌর্ব্বল্য সাজে না। কৃষ্ণের এই কথাটীতে অকস্মাৎ নিরুদ্যম অর্জ্জুনের চিত্তস্থিত নৈরাশ্যের মেঘরাশি ভেদ ক'রে অমিতবিক্রমে অতর্কিতভাবে, একটা সুপ্রবল আত্মশক্তির প্রদীপ্ত তড়িৎরেখা বিস্ফুরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। অর্জ্জুন ভাবলেন, আপাতপ্রতীয়মান আমার এই শক্তিহীনতা—এটা কি মায়া? মোহতন্দ্রাতুর আমি,—সত্যই কি আমার দ্বারা কুরুপাণ্ডবের দ্বৈরথ যুদ্ধে কীর্ত্তিকেতন উড্ডীন হবার আশা আছে?—শ্রীকৃষ্ণ, ভ্রষ্টলক্ষ্য পার্থকে মেঘগম্ভীরস্বরে পুনরায় বললেন, "মামনুস্মর যুধ্য চ"। কুরুপাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধে পরস্পরের ভবিষ্যৎ পরিণতি

ভাল হৌক বা মন্দ হৌক, এ যুদ্ধে তোমাকে প্রবৃত্ত হ'তেই হবে; অর্জ্জুন! এই যুদ্ধে বহু আত্মীয় ধ্বংস হবে এবং তজ্জন্য লোকে তোমাকে নিন্দা করতে পারে, সমাজেও তুমি অপাংক্তেয় হ'তে পার, তবু তোমাকে বলছি,—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!"—দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর, যুদ্ধে অগ্রসর হও। মেঘমধ্যে অতিবাতের ন্যায় কৃষ্ণের এই কথাগুলিতে অর্জ্জুনের মোহমেঘ ক্ষণমধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল। অর্জ্জুনের চক্ষুতে আগুনের ফিন্‌কি ছুটতে লাগল, সহসা বাহুদ্বয় তপ্তরক্তধারায় চঞ্চল হ'য়ে উঠল; ত্যক্ত গাণ্ডীব সহসা যেন তাঁর মনে ক্ষাত্রবীর্য্যের স্মৃতি জাগিয়ে দিল! শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু কক্ষভ্রষ্ট নক্ষত্রবৎ তাঁর দেহমনের অসাড়তার মধ্য দিয়ে ছুটাছুটি আরম্ভ করল। * * * তার পরে যা ঘটেছিল, মহাভারতের পাঠকগণের কাছে তা' অবিদিত নাই।

মহাভারতে বর্ণিত এই যে অর্জ্জুনের চরিত্র, ইহা শুধু প্রাচীন কাব্যকথা মাত্র নয়—কুরুক্ষেত্রবিজয়ী অর্জ্জুনের চরিত্র, নিখিল মানবের চরিত্রপুঞ্জের মূর্ত্ত পরিব্যক্তি।—অবসাদ, নিরুৎসাহ, জড়তাপ্রমুখ প্রবল কৌরবপক্ষ নরনারায়ণের চিরশত্রু। একা অর্জ্জুন নয়, আমরা প্রত্যেকেই অবসাদরূপ কুচক্রী দুর্য্যোধনের দ্বারা উৎপীড়িত হই। সংসার-কুরুক্ষেত্রে অবসাদের ন্যায় শক্তিশালী শত্রু আর কে আছে? কর্ত্তব্যের গাণ্ডীব আমাদেরও হস্তচ্যুত হয়, কর্ম্মনাশা অবসাদে আমরাও মুহ্যমান হ'য়ে পড়ি, কিন্তু তথাপি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার উত্তুঙ্গ শৈল শৃঙ্গ হ'তে আমরা যেন নৈরাশ্যের পল্বল-কর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত না হই, আত্মার চরম অবমান না করি। অনন্ত দুঃখ ও অবিরত নিষ্ফলতার সঙ্গে সারাজীবন যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। কারণ জীবন-কুরুক্ষেত্রে কৌরবপক্ষ চিরকালই প্রভাবান্বিত। অবসাদে জর্জ্জরিত ও অবসন্ন হ'লেই বিরুদ্ধ পক্ষের শরাঘাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। সিদ্ধিলাভের জন্য অবিরত চেষ্টা করা চাই, প্রাণপণ প্রয়াসে জীবনসংগ্রামে জয়শ্রীলাভের জন্য উগ্র তপঃশক্তিপ্রয়োগে নিরন্তর "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন" এই প্রতিজ্ঞা সহকারে জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করা চাই, খাটুনি খাটা চাই।

সিদ্ধিলাভের জন্য মানুষের চেষ্টার পরিণাম অনেক ক্ষেত্রেই নিরর্থক পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়, কিন্তু তাই ব'লে চুপ ক'রে বসে থাকলে কি ক'রে চলবে? অগ্রসর হ'তে গিয়ে পিছিয়ে পড়া বিচিত্র নয়, হয়তো বহুদিনের সাধনাতেও সিদ্ধির পথে না-ও এগোতে পারি,—তাই ব'লে কি অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির পরীক্ষা লব না? সাধনার দুঃসহ আনন্দ থেকে দূরে নির্ব্বাসিত রইব? পরিশ্রমের ফলে সিদ্ধি আসে উত্তম, নচেৎ পুনরায় অক্লান্ত শ্রম—উগ্র তপঃপ্রয়োগ। একাগ্র চেষ্টার সাহায্যে বিজয়ী হবার জন্য নূতন ক'রে সেই কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ সাধনার পথেই আবার ফিরে আসা!! একেই ত মনুষ্যত্ব বলে। আত্মশক্তি যাতে দেশবাসীর মধ্যে জাগে তেমন শিক্ষা, দীক্ষা, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান চাই। যে প্রতিষ্ঠানে মানুষের প্রাণে উৎসাহের দীপ্ত বহ্নিজ্বালা জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, তেমন শিক্ষাশালা না হ'লে আমাদের কর্ম্মকুণ্ঠ স্থবির জাতির ছেলে মেয়েরা ক্রমান্বয়ে পঙ্গু হ'তে থাকবে।

পাশ্চাত্য দেশে দিনের বেলায় যে কর্ম্মের প্রবল তুফান ছুটে, রাত্রিকালেও সে কর্ম্মস্রোতের বিরাম হয় না। সুপ্রসিদ্ধ এডিসন সাহেব প্রায় সারা রাত্রি জেগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক'রতেন। তাঁর কর্ম্মপ্রাণতার ফলে তাঁর সহযোগীদেরও কর্ম্মশক্তি যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল এবং এই এডিসন আপন দৃষ্টান্তে এমন কতকগুলি কর্ম্মী তৈয়ার ক'রে তুলেছেন যে, কুঁড়েমীর প্রশ্রয় তাঁরা কিছুতেই দেবেন না। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক রাত্রিতে কাজ কর্ম্ম করা দূরে থাক, দিবাভাগেও হাত-পা চুল্‌কিয়ে, নিশ্চেষ্ট অবসন্নতায়, গ্লানিপূর্ণ জীবনের জীর্ণতায় সময়রত্নকে বৃথা ব্যয় করে। সময়ের মূল্য এদেশে নাই। বলতে গেলে তিক্ত শোনায়, কিন্তু সত্য কথা এই যে, আমরা চালাকি চিনি, বুজরুগী চিনি, পরহিংসা, প্রতারণা চিনি, কিন্তু সময়কে চিনি না। জাড্য, অবসাদ, আত্মগ্লানি, নিশ্চেষ্টতা চিনি,—চিনিতে ইচ্ছা করি না কর্ম্ম—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা; চিনিতে চাই না—সত্য-শিব-সুন্দরকে। কি সাহিত্যক্ষেত্রে, কি

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে স্বল্পশ্রমে, স্বল্পত্যাগে, স্বল্পবিদ্যায় দিগ্‌গজ হওয়ার প্রলোভনে আমাদের জাতিটা উচ্ছন্নের পথে চলেছে। আরাধনা না করলে দেবতাকে পাওয়া যায় না, ইহাও কি নূতন ক'রে বলতে হবে? পৃথ্বীক্ষেত্র হ'তে সার্থকতার সারশস্য সংগ্রহের জন্য প্রখর দুঃখসূর্য্যতাপে দগ্ধ হ'য়ে হল-কর্ষণ করতে হয়, ঝথাবর্ষার ক্ষুরকরকাপ্রপাতে সহাস্যমুখে নিত্য জর্জ্জরিত হ'তে হয়।

ওগো সুখসাগরের কাণ্ডারীর দল! সহজপথের সহজিয়াগণ! এত কষ্টের পরিণামেও কত জায়গায় নিষ্ফলতার দুর্ভিক্ষ ঘটে। জগৎটা যে কঠিন, বন্ধুর, নিষ্ঠুর;—পৃথিবীটাও যে অগ্নিময় একটা ঘূর্ণ্যমান গ্রহ! এই গ্রহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হ'লে আমাদেরও অগ্নির ন্যায় দুর্ব্বারণীয় তেজবীর্য্য অর্জ্জন করতে হবে। শান্তি কোথায়? নিদ্রার অবসর কই? বিরাট বিশ্বগোলক উদ্দাম, অনিবার্য্য গতিস্রোতে বায়ুতাড়িত মেঘপুঞ্জের ন্যায় বিমান-বর্ত্মে আঘূর্ণিত হচ্ছে। আমাদেরও জীবনের ছন্দ ঐ গতির সুরে গেঁথে তোলা একান্ত প্রয়োজন। শান্তিরাজ্যের স্বর্ণতোরণ কর্ম্মবলেই আয়ত্ত হয়—নিশ্চেষ্টতার দ্বারা নয়। শান্তি, শান্তি ব'লে উচ্চৈঃস্বরে কোটীজন্ম চীৎকার করলেও, কর্ম্মকুণ্ঠ ব্যক্তি শান্তি পাবে না। আপৎকণ্টকাকীর্ণ দুঃখ-দুর্য্যোগের মধ্য দিয়েই শান্তিসুখের সন্ধান পাওয়া যায়। মানবসভ্যতার অভিব্যক্তির ইতিহাস অবর্ণনীয় দুঃখের নিরবচ্ছিন্নতায় পরিপূর্ণ। তবু ত মহাপুরুষগণ একথা কোন দিন বলেন নাই যে, দুঃখকে এড়িয়ে সুখ চাই। উচ্চাদর্শের নিকট সমস্ত স্বার্থসুখ বলি দেওয়াই পুরুষার্থ। সিদ্ধার্থ, ক্রাইষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি বিশ্বহিতব্রতী সাধুগণ কথায় ও কার্য্যে জগৎকে দেখিয়েছেন যে, ত্যাগের কষ্টই কল্যাণপথের পাথেয়। সুখ তুচ্ছ—দুঃখই বরণীয়। সুখমত্ত দুর্বৃত্তেরা ক্রাইষ্টকে খুন করেছিল, সক্রেটিসকে যন্ত্রণা দিয়েছিল,—আজ কোথায় সেই দস্যুদল? কাহারা আজ জয়গৌরবে উচ্চশির? প্রহারকগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু প্রহৃতগণ শতাব্দীর অন্ধকার মেঘমালা ভেদ ক'রে প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কবৎ বিশ্বজনচক্ষে অমিয় কিরণ বর্ষণ করছেন। সুখস্পৃহা? উহা পঙ্ককুণ্ড। শান্তি? উহা ক্লৈব্য মাত্র। জড়তা? উহা নরকের পুষ্পিত পন্থা। ঐ সকল আমাদের ত্যাগ করা আশু আবশ্যক।

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

অর্জ্জুনের প্রতি প্রযুক্ত শ্লোকটি মানবমাত্রেরই প্রতি প্রযুজ্য। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র খুঁজিয়াছি কিন্তু এ জাতীয় শ্লোক অধিক চক্ষে পড়ে নাই। "নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে"! অর্থাৎ তোমাতে ইহা সাজে না। এটা বড় মূল্যবান কথা। তোমাতে দৌর্ব্বল্য সাজে না, তপঃকুণ্ঠা সাজে না, ত্যাগভীরুতা সাজে না, অসত্য কিছুই তোমার আরাধ্য নহে। শ্রেয় লাভের জন্য দুঃখের কণ্টকমুকুট গৌরবের সহিত মাথায় ধারণ ক'রে সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজায় ব্রতী হ'তে হবে।

প্রাণহীন পৃথিবীকে জীবনের বন্যায় ভাসিয়ে দাও। ত্যাগের গঙ্গোত্রীপ্রবাহে কঙ্কালেও জীবনের সাড়া আনয়ন কর—হৃদ্‌যমুনায় জীবনের অমিয় সুতান জাগিয়ে তোল। আরাম ও সোয়াস্তি, এবং আত্মপরিচর্য্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রুদ্র ধ্বজা উড়াও। মৃত্যুসঞ্জীবন প্রবল প্রাণ অধিকাংশ লোকেরই নাই, ধরণী প্রাণশূন্য কঙ্কালের জীর্ণতম শ্মশানশয্যায় পরিণত হ'তে চলেছে,—এই শ্মশানকে প্রাণের অজস্র ধারায়, গানের অফুরন্ত মাধুরীতে ভরিয়ে দিতে হবে। প্রভূত উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন, সুপ্রচুর উর্ব্বর ভূমিসম্পৎযুক্ত এই অন্নপূর্ণার দেশে দারিদ্র্যযন্ত্রণা কেন? "ভগবান", "ভগবান" ক'রে এত চেঁচামেচি, গেরুয়ার প্রাদুর্ভাব, জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব, শতবিধ উপধর্ম্মের ছড়াছড়ি হচ্ছে তবু দেশব্যাপী অশান্তির দাবাগ্নি কেন? ভেদ কেন, বৈষম্য কেন, পরগ্লানি কেন, ভণ্ডামি কেন, প্রতারণা কেন? আমাদের দেশে কাজ করবার লোকের এত অভাব কেন? উচ্চ চিন্তাগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য তড়িৎশক্তিপূর্ণ তেজস্বী কর্ম্মীর আধিক্য নাই কেন? সকল কার্য্যেরই গোড়ায় গলদ কেন? ফাঁকি দিয়ে এ দুঃখ মোচন হবে না। দেশে এখন চাই ক্লান্তিক্লেশহীন নিরলস ও সরলপ্রাণ বহুসংখ্যক ধীর কর্ম্মব্রতী দল,—যারা "বয়সের

ত্রুটী, জরার ভ্রূকুটি” উপেক্ষা ক’রে সত্য-শিব-সুন্দরের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক’রে সাধনায় যত্নবান হবে। বিশ্বহিতব্রতে অগ্রসর হ’লে অর্জ্জুনের মত সকলেরই অবসাদ, তন্দ্রা ও ভয় আসতে পারে; সুহৎ কর্ম্মে ব্রতী হ’লে আমরাও ক্লান্ত হ’য়ে পড়তে পারি, কিন্তু সাধনার শক্তি অসীম। সাধনাসাগরে স্নাত হ’লে কর্ম্মক্লান্তি দূর হ’তে তিলার্দ্ধ সময় লাগবে না। নৈরাশ্য-সংঘাতে কাপুরুষের মত নিজেকে নিরাশ্রয় মনে করা কিছুতেই উচিত নয়। প্রতীচ্যের কর্ম্মবীরগণের জীবনীতে মরুবিজয়ের মন্ত্র আছে, সেই মৃত্যুঞ্জয় কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে লক্ষ লক্ষ সাধক বাংলার বহু দুঃখ দৈন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করুন। গ্রহ নক্ষত্রে, ভিসুভিয়স পর্ব্বতগহ্বরে, প্রকৃতির গোপনতম কক্ষে, কোথায় না প্রতীচ্য দেশের কর্ম্মিগণের উৎসাহধারা দুর্ব্বার বেগে ছুটেছে? জীবনকে দুঃখের মুখে অক্লেশে উৎসর্গ করতে পারে তাই উহারা সুখীও হয়। আমরা দুঃখ বর্জ্জন ক’রে সুখ চাই, নির্ঝঞ্ঝাটে সিদ্ধি চাই, বিনা তপস্যায় সাফল্য চাই, তাই অনবরত দুঃখই আমাদের সাথী—অব্যাহত সুখ আমাদের অদৃষ্টে নেই। যদি প্রকৃত সার্থকতা পেতে চাই, তা হ’লে “নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে”, এই কথাটীর মর্ম্ম আমাদের জাতিকে অবিলম্বে উপলব্ধি করতে হবে।

রামমোহন-স্মৃতিসভা।

গৌহাটি ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে মহা সমারোহে স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের বাৎসরিক স্মৃতিসভা গত ২৭শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় হইয়া গিয়াছে। আর্ল ল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে, বড়ুয়ার প্রস্তাবে এবং ব্রাহ্মসমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের অনুমোদনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। গৌহাটী ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কমললোচন দাস সভাপতি মহোদয়কে পুষ্পমাল্য দিয়া বরণ করিলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্তা লতিকা দেবী (অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে. বড়ুয়ার পত্নী) স্বর্গীয় মহাত্মার বিষয়ে একটী রচনা পাঠ করেন। তৎপর মিস্ বি. দাস, আর্ল’ল কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত তারিণীকমল পণ্ডিত বি-এ, মিসেস্ বি. দাস, শ্রীমান এস্. কে. দাস, আর্ল’ল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ ফুকন বি-এল্ এবং গৌহাটী বালিকা হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মাখনলাল মৈত্র প্রভৃতি আরও কয়েকজন বক্তা ও মহিলা তাঁহাদের বক্তৃতা পাঠে সমাগত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাদের মনোরঞ্জন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় আসামী ভাষার স্বর্গীয় মহাত্মার বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ সরস বক্তৃতা করিয়া সকলকে মোহিত করিলেন। শ্রীযুক্ত কমললোচন দাস সভাপতি এবং অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ দিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

দুইটী সঙ্গীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস বি. ই, এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীমান দিলীপকুমার তাঁহাদের সুললিতকণ্ঠের সঙ্গীতে সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

যদিও মহাত্মা রামমোহন আজ ৯০ বৎসর হইল নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তিনি এখনও জীবিত আছেন। বাঙ্গলা এবং আসাম দেশের সর্ব্বত্রই তিনি সুপরিচিত এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেও তাঁহার বাৎসরিক স্মৃতিসভা হইয়া থাকে। রামমোহন রায়ের মৃত্যু মৃত্যুই নহে, তাহা অমৃত।

আসামের সহিত সেই সুদূর সময়েও রামমোহনের সম্পর্ক ছিল। ৺গুণাভিরাম বড়ুয়ার এবং ৺আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের জীবনচরিত পাঠ করিলে জানা যায় যে, ৺যজ্ঞরাম খারঘরিয়া ফুকনের সহিত রাজার পরিচয় ছিল এবং খারঘরিয়া ফুকন মহাশয় মহাত্মার সহিত উপাসনায় যোগ দিতেন। সেই সময়ে গৌহাটী হইতে কলিকাতায় ডাক বার দিনে যাইত এবং সাধারণ নৌকায় যাইতে একমাস লাগিত। তখন কোনও প্রকার বাষ্প যানের প্রচলন হয় নাই।

মহাভারতের

নীতি-বাক্য।

বনপর্ব্ব।

(৺অনাথকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

ব্যাস।—যাহার জন্মাবধি যেরূপ স্বভাব হইয়া থাকে, সে না মরিলে তাহা কদাচ যায় না। স্বজনের সহিত বিবাদ নিতান্ত নিন্দনীয়।

(আরণ্যক পর্ব্বাধ্যায়,—৩১

কৃষ্ণ।—যে ব্যক্তি ঘৃণিত লোকের অনুগামী হয়, সেও বধ্য, এই সনাতন ধর্ম্ম। (ঐ—৪৬

কৃষ্ণ।—স্ত্রী, দ্যুত, মৃগয়া ও সুরাপান এই কামসমুত্থিত ব্যসনচতুষ্টয় দ্বারা লোক শ্রীভ্রষ্ট হয়।

(অর্জুনাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়—৫৭

দ্রৌপদী—ভার্য্যা রক্ষিত হইলে প্রজা রক্ষিত হয়, প্রজা রক্ষা হইলে আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকে।

(ঐ—৫১

কৃষ্ণ।—শত্রু সর্ব্বতোভাবে বধার্হ, সে দুর্ব্বল হইলেও বলবানের অনুপেক্ষণীয়। (ঐ—৭৯

কৃষ্ণ।—সেতু ভিন্ন হইলে, জলবেগ নিবারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। (ঐ—৮১

মার্কণ্ডেয়।—সমস্ত ভূতগণ বিধিকৃত বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়াই স্বকুলোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে।

(ঐ—৮৭

বক (মুনি)।—কেহই ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া এই লোক বা পরলোক জয় করিতে পারে না। (ঐ—৮৮

দ্রৌপদী।—সময়বিশেষে ক্ষমাও অবলম্বন করিতে হইবে; কেন না যে ক্ষত্রিয় ক্ষমাকালে ক্ষমাবলম্বন না করেন, তিনি সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হইয়া ইহকালে বা পরকালে বিনাশপ্রাপ্ত হন। (ঐ—৯৩

দ্রৌপদী।—নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না এবং একমাত্র ক্ষমা অবলম্বনেও শুভলাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত কেবল ক্ষমা আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে।

(ঐ

প্রহ্লাদ।—যিনি ক্রোধভরে অন্যায়পূর্ব্বক মনুষ্যকে বহুবিধ দণ্ড প্রদান করেন, তিনি অচিরাৎ স্বজন, ধন ও প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন সন্দেহ নাই।

(অর্জুনাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়—৯৫

প্রহ্লাদ।—একেবারে তেজ প্রদর্শন করা অথবা একেবারে মৃদুস্বভাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ। সময়ানুসারে তেজস্বিতা বা মৃদুভাব আশ্রয় করিবে।

যিনি যথাযোগ্য কালে মৃদুভাবাবলম্বী বা রোষপরবশ হয়েন, তিনিই ইহকাল ও পরকালে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। (ঐ—৯৫

পূর্ব্বে যে ব্যক্তি তোমার বহুবিধ উপকার করিয়া পরে কোন গুরুতর অপরাধে পতিত হয়, তাহার উপকার করিয়া সেই অপরাধ ক্ষমা করা উচিত।

যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ অন্যের নিকটে অপরাধী হয় তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়, কারণ সকলে শ্রেয়স্করী বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। (ঐ—৯৬

যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহার অপলাপে প্রবৃত্ত হয়, অপকার অল্প হইলেও সেই সকল পাপাত্মা কুটিল লোকদিগকে সংহার করিবে।

প্রথম অপরাধে সকল প্রাণীকেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।

সামরূপ উপায় দ্বারা কি উগ্রস্বভাব কি মৃদুস্বভাব সম্পন্ন সকলকেই সংহার করা যায়। জগতীতলে সামের অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব সামই বলীয়ান উপায়।

দেশকালের প্রতীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(ঐ—৯৬

যুধিষ্ঠির।—ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে ও ক্রোধই মঙ্গলের কারণ হয়; সুতরাং সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয় তাহারই মঙ্গল।

যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়।

(ঐ—৯৭

যুধিষ্ঠির।—যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্ম-পর উভয়কেই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে; সুতরাং সে ব্যক্তি আত্ম-পর উভয়েরই উপকারক হইয়া উঠে।

দুর্ব্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয়।

সাধুলোকেরা জিতক্রোধ ব্যক্তিকে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ক্ষমাপর সজ্জন ব্যক্তির নিশ্চয়ই জয়লাভ হইয়া থাকে।

মিথ্যা অপেক্ষা সত্যই শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও নৃশংসাচার অপেক্ষা অনৃশংসতাই নিতান্ত শ্রেয়ঃ।

যিনি বুদ্ধিবলে প্রবল ক্রোধ বশীভূত করিতে সমর্থ হন, যাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের সঞ্চার থাকে না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(অর্জুনাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়—৯৮

মূর্খেরাই ক্রোধকে তেজ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে।

যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিবে, তথাপি কোন ক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না।

হীনমতি মূঢ় ব্যক্তিই ক্ষমার্জ্জবাদি গুণসকল লঙ্ঘন করিয়া থাকে।

তাপিত হইলেই তাপ প্রদান করিবে ও গুরু কর্ত্তৃক আহত হইলেই তাঁহাকে আঘাত করিবে, কেহ আক্রোশ প্রকাশ করিলে তাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিবে, হিংসা করিলেই হিংসা করিবে এইরূপ রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করিলে সমুদায় জগৎ বিনষ্ট ও অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইত। (ঐ—৯৯-১০০